রবি-কথা

রবি-কথা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে
প্রথম প্রকাশ : ৭ই অগ্রহায়ণ ১৮৮৩ শকাব্দ



প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

মুদ্রাকর শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা : মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

উৎসর্গ

আ-কৈশোরের বন্ধু

শ্রীঅমল হোমকে

প্রভাতকুমারের অর্ঘ্য

বোলপুর, শান্তিনিকেতন

২৮ অক্টোবর, ১৯৬১

ভূমিকা

'রবি-কথা' লিখবার জন্য অনুরোধ আসে কলকাতা আকাশবাণী থেকে। তার ব্যবস্থা করেন শ্রীঅমল হোম—তখন রবীন্দ্রনাথের উৎসব সূচী প্রণয়নের জন্য দিল্লী আকাশবাণীর সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহেই এটি লিখিত হয়।

তার পর সাহিত্যিকদের বন্ধু বিশু মুখুজ্জের মাধ্যমে পরিচয় হলো জিতেন মুখুজ্জের সঙ্গে। তিনি এই গ্রন্থখানি প্রকাশনের ভার গ্রহণ করেছেন; তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনীর চাহিদা এতে পাঠকদের মিটবে না জানি, রেখাঙ্কনে তাঁর জীবনকথা বহুস্থলে তাঁরই ভাষায় বলবার চেষ্টা করেছি।

রেডিওতে বেতার রূপ দিয়েছিলেন আমার নাম-অপহারক অজানা মিতা প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বেতার রূপটি লোকের ভাল লেগেছিল জেনেই এটি প্রকাশনের ব্যবস্থা করি।

বোলপুর, শান্তিনিকেতন

১১ নভেম্বর, ১৯৬১

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



রবীন্দ্রনাথ

প্রথম স্তবক

(১৮৬১—১৮৮৪)

আড়াই শ' বৎসর আগের কথা—ইংরেজ বাণিয়ারা জাহাজে করে এসে কলকাতায় বসত শুরু করেছে, ব্যবসা বাণিজ্য করে দেশী-লোকের সঙ্গে। সেই গঙ্গার ধারে গোবিন্দপুর গাঁয়ে যশোহর থেকে নৌকো করে এলো জনকয়েক ব্রাহ্মণ। সে-গাঁয়ে ব্রাহ্মণ নেই একঘরও—যে সব লোক আছে তারা গরীব—বর্ণহিন্দুর চোখে তখনকার দিনে অজাত। এক ঘর ব্রাহ্মণ এসে তাদের মধ্যে ঘর বানিয়ে বাস করছে—লোকে তো কৃতার্থ। বলে তাঁদের 'ঠাকুর মশাই'। পঞ্চানন 'ঠাকুর মশাই' জাহাজী কাপ্তানদের মাল সরবরাহ করেন—সাহেবরাও তাঁকে বলতে শুরু করে দিলো 'ঠাকুর'—ঠাকুর কথাটা তাদের উচ্চারণে হলো 'ট্যাগোর'। তাঁদের কুশারী পদবী লোপ পেলো—হলেন তাঁরা 'ঠাকুর'।

জয়রাম ঠাকুর থেকে সংসারে ধনাগমের সূত্রপাত। এই বংশের দুই ভাই দর্পনারায়ণ ও নীলমণি। দুই ভাই চাকরি ক'রে, ব্যবসা ক'রে বেশ টাকা জমান। কলকাতা অঞ্চলের পাথুরিয়াঘাটায় জমিজমা কিনে ঘরবাড়ি তৈরি করেন। অর্থ হলো অনর্থের মূল। ভাইয়ে ভাইয়ে মন কষাকষি চলে কিছুদিন। তারপর নীলমণি তাঁর ভাইকে বিষয় সম্পত্তি ঘরবাড়ি সব ছেড়ে দিলেন,—বিনিময়ে পেলেন একলক্ষ টাকা ও লক্ষ্মীনারায়ণের শালগ্রামশিলা। তাই নিয়ে নীলমণি বাড়ি ছাড়লেন। তারপর জোড়াসাঁকো অঞ্চলে কিছু জমি কিনে মাথা গোঁজবার মতো একটা ঘর বানিয়ে নিলেন। এই হলো জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সূত্রপাত। এটা ঘটে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে। আমরা যে মহর্ষি-ভবনে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে উৎসব করতে যাই, তার পত্তন হলো সেই দিন। অর্থাৎ ১৭৮৪ অব্দের জুন মাসে।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ধন মান মর্যাদা এলো দ্বারকানাথ থেকে—ইনি রবীন্দ্রনাথের পিতামহ। কোম্পানীর যুগে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও ধনবান বলে কী নামডাকটাই হয়েছিল, কী শ্রদ্ধাই করতো লোকে! দানে ধ্যানে খরচ করতেন দু'হাতে। বাঙালি, ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী সকলেই প্রয়োজনের সময় সাহায্য পায় তাঁর কাছ থেকে। তাঁর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ির জলসায় ও ভোজসভায় নিমন্ত্রণ পাবার জন্য বড় বড় সাহেব মেমরা সুযোগ খুঁজতেন।

সাহেবদের সঙ্গে সমানে সমানে ব্যবহার করবার সাহস বহুকাল আমাদের হয়নি, সকলেই তাদের কাছে জড়সড়। দ্বারকানাথ জানতেন কী করে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, মাথা উঁচু করে চলতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"আমাদের পিতামহ রাজপুরুষদিগকে বেলগাছিয়ার বাগানে নিমন্ত্রণ করিয়া সর্বদা ভোজ দিতেন....। কিন্তু শুনিয়াছি তিনি পিতাকে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ইংরাজকে যেন খানা দেওয়া না হয়।" সে যুগের বাণিয়া ইংরাজকে খুব ভাল করে চিনতেন বলেই তিনি পুত্রকে এই উপদেশ দিয়ে যান।

দ্বারকানাথের যেমন আয় তেমনি ব্যয়। কলকাতার কত ভালো কাজে যে তাঁর দান আছে তার তালিকা দেখলে অবাক হতে হয়। রাজা রামমোহন রায়ের এত বড় বন্ধু আর কেউ ছিল না। তবে সাধারণভাবে রাজার মতামত মানলেও হিন্দুধর্মের পূজাপার্বণ তিনি ত্যাগ করেননি। রামমোহনের মত গ্রহণ করে তাঁর বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন (১৮৪৩)। দ্বারকানাথ বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তার বেশি আর কিছু করেননি। তবে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন এ ছেলের হাতে তাঁর বিষয় সম্পত্তি পড়লে সব নষ্ট হয়ে যাবে। তাই বিলাত যাবার আগে বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে খুব আঁটসাট করে গিয়েছিলেন।

দ্বারকানাথ দু'বার য়ুরোপ যান—শেষবার ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়। এতো অপরিমিত টাকা ব্যয় করতেন বিলেতে যে লোকে তাঁকে বলতো 'প্রিন্স্'। তাঁর জীবনকথা বলবার মতো, শোনবার মতো।

পিতার হঠাৎ মৃত্যু হলো বিলাতে। বিশাল ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাংকের কাজ, সমস্তর মধ্যে ভাঙন ধরলো। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম নিয়ে থাকতে চান—বিষয় সম্পত্তি যাক—মুক্তি চান। পিতার ঋণশোধের জন্য সমস্ত দিলেন বিক্রি করে, এমন কি হাতের আংটিটি পর্যন্ত।.... "আমি যা চাই, তাই হইল। বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেশ মিলে গেল।" পিতার ঋণ শুধতে সমস্ত গেল। এমন কি পিতার একটি প্রতিশ্রুত দানের টাকা মায় সুদ সমেত তিনি দিয়ে দেন।

এই ভাবে দারিদ্র্য বরণ করে নিলেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

"আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না। আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেক কালের বাড়ি....ঠাকুরদালান, তিনচারটে উঠোন, সদর অন্দরে বাগান, সম্বৎসরের গঙ্গাজল ঘরে রাখবার মোটা মোটা জালা সাজানো অন্ধকার ঘর। পূর্বযুগের নানা পাল-পার্বণের পর্যায় একদিন চলাচল করেছিল,—আমি তার সংস্কৃতির বাইরে পড়ে গেছি। যে সংসারে প্রথম চোখ মেলেছিলুম, সে ছিল অতি নিভৃত। আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল।....আমি এলাম যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল। আমাদের চাল ছিল গরীবের মতো।....পরনে কাপড় ছিল নেহাত সাধাসিধে। অনেক সময় লেগেছিল পায়ে মোজা উঠতে।....গাড়ি ঘোড়ার বালাই ছিল না বললেই হয়। বাইরের কোণের দিকে তেঁতুলগাছের তলায় ছিল চালাঘরে একটা পালকি গাড়ি, আর একটা বুড়ো ঘোড়া।"

রবীন্দ্রনাথ—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র—চোদ্দজন ভাই-বোনের সবথেকে ছোট। এ সংসারে এলেন ভোরের বেলা ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ (৭ মে, ১৮৬১)। বিশাল একান্নবর্তী পরিবার—দাদা, বৌদিদি, ভাইপো, ভাইঝি, ভগ্নী, ভগ্নীপতি,ভাগ্নেয়, ভাগ্নেয়ী ছাড়া কত আত্মীয়-কুটুম্ব, আশ্রিত এসো-জন বসো-জন। তার মধ্যে বালকদের দিন কাটে চাকরদের হেপাজতে।

সকলেই স্কুলে যায়, বালক রবিকেও যেতে হয়। এই স্কুলে পড়া নিয়েই হ'লো সমস্যা—চারদেওয়ালের ঘর—মন বসে না সেখানে। এ-স্কুল সে-স্কুল বদল চলে। সন্ধ্যাবেলায় পড়াবার জন্য শিক্ষক আসেন—কিন্তু মন ভেসে চলে কল্পনার পাল তুলে।

'কিশোরী চাটুজ্যে হঠাৎ জুটতো সন্ধ্যা হলে,
বাঁ হাতে তার থেলো হুঁকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া,
মনে মনে ইচ্ছা হোতো যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হোতো এই পাঁচালির দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।'

গানটা ছিল ঠাকুরবাড়ির মস্ত একটা সম্পদ, ছোটবেলা থেকে বিষ্ণুর কাছে এবং আর একটু বড় হলে যদুভট্টর কাছে গান শিখতেন।

"আমাদের পরিবারে গান চর্চার মধ্যেই শিশুকাল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না, তাহা মনে পড়ে না।"

"ইচ্ছেমতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভরতি করেছি তাই দিয়েই।....শেখবার পথে কিছুতেই আমাকে বেশিদিন চালাতে পারেনি।"....

স্কুলে পড়ারও সেই দশা—মন নেই বাঁধাধরা পড়ায়। এমনি সময়ে উপনয়ন হলো। মাথা নেড়া। কেমন করে সে অবস্থায় ফিরিঙ্গি স্কুলে যাবেন এই দুর্ভাবনায় দিন যায়। এমন সময় পিতা তাকে নিয়ে চললেন হিমালয় বেড়াতে—তখন বালকের বয়স বারো বৎসরও হয়নি। পথে কয়দিন বোলপুরে নেমে শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে গেলেন। বালকের এই প্রথম ট্রেনে চড়া—নূতন দেশে আসা, শান্তিনিকেতন প্রথম দর্শন। তখন কে জানতো এই স্থানটাই হবে কবি বালকের সাধনপীঠ। এই শান্তিনিকেতনে এক শিশু নারকেল গাছের তলায় বসে "পৃথ্বীরাজ পরাজয়" নামে রীতিমত একটা নাটক কবিতায় লিখে ফেললেন।

"ইতিপূর্বেই কোনো একটা ভরসা পেয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করেছিলুম, লোকে যাকে বলে কবিতা, সেই ছন্দ-মেলানো মিল-করা ছড়াগুলো সাধারণ কলম দিয়েই সাধারণ লোকে লিখে থাকে।....পয়ার ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকার বোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম।....

"শুরু হল আমার ভাঙা ছন্দে টুকরো কাব্যের পালা উল্কাবৃষ্টির মতো, বালকের যা-তা ভাবের এলোমেলো কাঁচা গাঁথুনী।"

পিতার সঙ্গে নানা শহর দেখতে দেখতে বোলপুর থেকে পৌঁছলেন পাঞ্জাবের অমৃতসরে।

"তখন আমার অল্প বয়স। পিতা আমাকে সঙ্গে করে হিমালয়ে চলেছেন ডালহৌসি পাহাড়ে। সকাল বেলায় ডাণ্ডি চড়ে বেরোতুম, অপরাহ্ণে ডাক-বাংলোয় বিশ্রাম হতো। আজও মনে আছে....শ্যাওলায় শ্যামল পাথরগুলোর উপর দিয়ে গুহার ভিতর থেকে ঝর্ণা নেমে উপত্যকায় কলশব্দ করে পড়ছে।"

"হিমালয় গিরিপথে চলেছিনু কবে বাল্যকালে
মনে পড়ে। ধূর্জটির তাণ্ডবের ডম্বরুর তালে

যেন গিরি পিছে গিরি উঠিছে নামিছে বারে বারে
তমোঘন অরণ্যের তল হতে মেঘের মাঝারে
ধরার ইঙ্গিত যেথা স্তব্ধ রহে শূন্যে অবলীন,
তুষার নিরুদ্ধবাণী বর্ণহীন, বর্ণনা বিহীন।....
সেই ছবিখানি রহিল স্মরণে
চিরদিন মনোমাঝে।"

হিমালয়ের এই স্মৃতি জাগে বৃদ্ধ বয়সে।

হিমালয় থেকে ফিরলেন। আবার স্কুলে যেতে হয়। ঘরে পড়ানোরও চেষ্টা হলো। তারপর ভর্তি করে দেওয়া হলো সেণ্টজেভিয়ার স্কুলে। কিন্তু সেখানেও স্কুলে যাওয়ার থেকে স্কুলে না-যাওয়ার দিনই বেশি। বাড়িতে পড়েন কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য, আর সেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ। মূল পড়েন শিক্ষকের সাহায্যে —তারপর অনুবাদ করতে হয় কবিতায়।

ম্যাকবেথের তর্জমা থেকে কিছুটা উঠিয়ে দিই—

"দেখ, একটা মাঝির মেয়ে
গোটা কতক বাদাম নিয়ে
খাচ্ছিল সে কচমচিয়ে
কচমচিয়ে, কচমচিয়ে—
চাইলুম তার কাছে গিয়ে
পোড়ারমুখী বললে রেগে
'ডাইনি মাগী যা তুই ভেগে'।
আলোপোয় তার স্বামী গেছে,
আমি যাব পাছে পাছে,
ধেড়ে একটা ইঁদুর হোয়ে
চালুনীতে যাব বোয়ে—
যা বলছি কোরব আমি, কোরব আমি—
নইকো আমি এমন মেয়ে।"

এমন সময়ে তাঁর মা'র মৃত্যু ঘটলো। বাড়ির ছোট ছেলে মাতৃহারা হলো—স্কুলে না যাওয়ার আরও একটা কারণ জুটলো। এই সময় থেকে মায়ের অভাব ভুললেন বাড়ির নূতন বৌঠাকুরাণীর কাছ থেকে—সেবা যত্ন স্নেহ পেয়ে। ইনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী—কবি-জীবনের ধ্রুবতারা—যাঁর কথা কবি জীবনভর বলেছেন নানা ভাবে।

এই জ্যোতিদাদা তাঁর থেকে তেরো বছরের বড়ো হলেও বন্ধুর মত ছিলেন—তাঁর সমস্ত কাজেই রবি সাকরেদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক স্বদেশীসভা করেন—'সঞ্জীবনী সভা'।

"আমার মতো অর্বাচীন এই সভার সভ্য হইল। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল।....দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপি চুপি—ইহাতেই সকলের লোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুরই প্রয়োজন ছিল না।"

কিন্তু 'হিন্দুমেলা' নামে যে উৎসব হত বৎসরে বৎসরে তার মধ্যে গোপনীয় কিছু ছিল না—দেশের লোকের মনে স্বাদেশিকতা, দেশের মৃতপ্রায় শিল্পকলার প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করবার জন্য কর্মকর্তাদের চেষ্টা। সেখানে ব্যায়ামচর্চা দেখানো হয়, কবিতাও পড়া হয়, রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার উপহার' নামে কবিতা এখানে আবৃত্তি করেন। সাধারণের সম্মুখে এই তাঁর প্রথম পাঠ ও আবৃত্তি এবং ছাপার হরপে নিজের নাম দেওয়া কবিতার এই প্রথম প্রকাশ। তখন বালক কবির বয়স ১৪ বৎসর। হিন্দুমেলার কবিতায় বালক কবি বলেন—

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নবীন জীবন,
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি॥ ১৮।

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে ॥ ২২

আরেকবার হিন্দুমেলায় লীটনের দিল্লী দরবার (১৮৭৭) এর মুখে বালক কবি একটি কবিতা পড়েন—সেটি ছাপা হয়নি ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্টের ভয়ে। তাই সেটাকে রদবদল করে তাঁর জ্যোতিদাদা এক নাটকের মধ্যে চালিয়ে দিলেন। ব্রিটিশের স্থলে মোগল বসিয়ে আইন বাঁচানো হয়েছিল। মূলের পাঠ ছিল—

বৃটিশরাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া, বৃটিশ চরণে
লোটাবে শির।
বৃটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক্—আমরা গাব না
আমরা গাব না, হরষে গান
এসগো আমরা যে ক'জন আছি
আমরা ধরিব আরেক তান।

এই হিন্দুমেলায় 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের রচিয়তা নবীনচন্দ্রের সহিত তরুণ রবির পরিচয় হয়। নবীনচন্দ্র লিখেছেন—

"দেখিলাম········সাদা ঢিলা ইজার চাপকান পরিহিত একটি সুন্দর নব-যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। বৃক্ষতলে যেন একটি স্বর্ণমূর্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।····সহাস মুখে করমর্দন কার্যটা শেষ হইলে, তিনি পকেট হইতে একটি নোটবুক বাহির করিয়া কয়েকটি গীত গাহিলেন ও কয়েকটি কবিতা গীতকণ্ঠে পাঠ করিলেন। মধুর

কামিনী লাঞ্ছন কণ্ঠে এবং কবিতার মাধুর্যে ও স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভায় আমি মুগ্ধ হইলাম।"

বালকের বয়স ষোলো। এই সময় ঠাকুরবাড়ি থেকে 'ভারতী' নামে মাসিকপত্র বের করা হোলো (১৮৭৭)। কয়েক বৎসর পূর্বে 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামে এক পত্রিকায় 'বনফুল' নামে এক কাব্য মাসের পর মাস বের হয়, গদ্য সমালোচনা ও পদ্য 'প্রলাপ'ও ছিল। কিন্তু এবার ঘরের কাগজ ভারতীতে যা লেখেন তাহাই ছাপা হয়, গদ্য পদ্য গান কাব্য ছোটগল্প এমন কি একটা উপন্যাসও শুরু করেন।

"সেটা কী যে বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিল না, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলেনি।" তবু চন্দ্রনাথ বসু সেই 'করুণা' গল্পের প্রশংসা করে পত্র দেন তরুণ লেখককে। সে সব লেখা এখন অচলিত হয়ে গেছে।

তবে ষোলো বছরের লেখা ভানুসিংহের পদাবলী এখনো গানের দরবারে তার অটল আসন বজায় রেখে আছে।

"একদিন মধ্যাহ্নে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলা দিনের ছায়াঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরে একটি ঘরে খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একটি শ্লেট লইয়া লিখিলাম—

'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোকলাজে
সজনি আও আও লো।
দেখলো সখি, শ্যামরায়
নয়ন প্রেম উথল যায়—
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।

আও আও সজনীবৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ—
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।'

বালক রটনা করিলেন, আদি সমাজের পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে এক প্রাচীন বৈষ্ণব কবির লেখা পাওয়া গেছে—তার নাম ভানুসিংহ ঠাকুর। এমন ধাপ্পা বিশ্বাস করার মতো লোকও দু'চারজন ছিল তখন।

স্কুল ছেড়ে ঘরে যথেষ্ট লেখাপড়া করছেন।—কিন্তু পাশ না করলে আখের তো অন্ধকার। মেজদা বিলাত থেকে পাশ করা সিবিলিয়ান, এখন আমেদাবাদে জজিয়তি করছেন। বাড়ির কর্তারা ঠিক করলেন রবিকে বিলাত পাঠিয়ে দিতে হবে—ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য। কিন্তু বিলাতে যে যাবেন, না জানেন ভালো ইংরাজি, না জানেন ইংরেজিয়ানা। তাই দুটোতে পোক্ত হওয়ার জন্য প্রথমে আমেদাবাদে ও পরে বোম্বাই-এ কয়েক মাস কাটাতে হলো।

"বোম্বাই-এর কোনো গৃহস্থঘরে আমি বাসা নিয়েছিলুম। সেই বাড়ির মেয়ে ঝকঝকে করে মেজে এনেছিলেন তাঁর শিক্ষা বিলেত থেকে। আমার বিদ্যে সামান্যই, আমাকে হেলা করলে দোষ দেওয়া যেতে পারত না। তা করেন নি। পুঁথিগত বিদ্যা ফলাবার মত পুঁজি আমার ছিল না, তাই সুবিধে পেলেই জানিয়ে দিতুম যে কবিতা লেখবার হাত আমার আছে।....কবির কাছ থেকে একটা ডাকনাম চাইলেন, দিলেম জুগিয়ে ....ইচ্ছে করেছিলেন সেই নামটি আমার কবিতার ছন্দে জড়িয়ে দিতে। বেঁধে দিলুম সেটা কাব্যের গাঁথুনিতে"—

শুন নলিনী, খোল গো আঁখি
ঘুম তোমার ভাঙিবে না কি,
দেখো তোমারি দুয়ার পরে
সখী, এসেছে তোমারি রবি।

মাস দুই বোম্বাইয়ে কাটিয়ে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলাত রওনা হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর এক ভক্ত বন্ধু 'কবিকাহিনী' কাব্য ছাপিয়েছেন। এই তাঁর প্রথম বই যা ছাপানো হলো। 'বনফুল' আরো আগের লেখা—কিন্তু বই আকারে ছাপা হয় পরে।

বিলাতে আসা, যাওয়া ও থাকায় প্রায় বৎসর দেড় কাটে। কিন্তু—

"আমি য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলুম তিনমাস মাত্র।.... ঐ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক পড়া হয়ে গেছে। সেই পড়া ক্লাসের পড়া নয়। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের মিলন। বিলেতে গেলাম, ব্যারিস্টার হইনি।"

বিলাত থেকে লেখেন পত্রধারা—

"একজন বাঙালি ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্তিত হয় তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়" এই পত্রগুলি থেকে। বিলাতের সমাজচিত্র ও সে-সম্বন্ধে মতামত দিয়ে যা-সব 'ভারতীতে' লিখতেন, তা পড়ে বাড়ির কর্তারা শংকিত হয়ে ওঠেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথকে দেশে ফিরে আসতে হলো মেজদা'দের সঙ্গে, ব্যারিস্টারি পড়া হলো না।

কয়েকমাস পরে আরেকবার ব্যারিস্টারি পড়বার জন্য বিলাত রওনা হন, কিন্তু মাদ্রাজ থেকেই ফিরে আসেন। লেখাপড়া শিখে পয়সা রোজগারের এই শেষ চেষ্টা। দেশে ফিরলেন খানিকটা মনমরা হয়ে,—

"বাংলাদেশে ফিরে এলাম। সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই দক্ষিণে বাতাস, সেই নিজের মনের বিজন স্বপন, ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে চারিদিক থেকে প্রসারিত সহস্র বন্ধন, সেই সুদীর্ঘ অবসর, কর্মহীন কল্পনা, আপনমনে সৌন্দর্যের মরীচিকা রচনা, নিষ্ফল দুরাশা, অন্তরের নিগূঢ় বেদনা, আত্মপীড়ক অলস কবিত্ব—এই সমস্ত নাগপাশের দ্বারা জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে পড়ে আছি।"

কিন্তু লেখনী স্তব্ধ নয়—কবিমানস রূপ পাচ্ছে নূতন কাব্যে। 'ভগ্নহৃদয়' নামে নূতন কাব্যে। 'ভগ্নহৃদয়' নামে একটি কাব্য শুরু করেছিলেন বিলাতে থাকতে, সেটা শেষ করে ছাপিয়ে প্রকাশ করছেন। আর 'রুদ্রচণ্ড' নামে নাটকও এই সময়ে প্রকাশিত হলো। এইটা রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক? আমাদের মনে হয় এটা বারো বৎসর বয়সে রচিত 'পৃথ্বীরাজ পরাজয়ে'র রূপান্তর।

ফরমাশ বা তাগিদ এলো ব্রহ্মসঙ্গীত লেখবার জন্য। যে ছেলে এই বয়সে এমন সুন্দর কবিতা, গান কাব্য লিখতে পারে সে কি আর ব্রহ্মসঙ্গীত লিখতে পারবে না? সামনেই মাঘোৎসব—তার জন্য সাতটি গান লিখলেন। এই হোলো প্রথম ধর্মসঙ্গীত রচনা। (১৮৮১)

এ কী এ সুন্দর শোভা। কী মুখ হেরি এ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি।
বলো হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কী ধন তোমারে দিব উপহার।
হৃদয় প্রাণ লহো লহো তুমি, কী বলিব
যাহা কিছু আছে মম সকলই লও হে নাথ।

এবার বড়োদের কাছ থেকে ফরমাশ হলো তাঁদের, 'বিদ্বজ্জন সমাগম' নামে সভা বা ক্লাবের উৎসবের জন্য একটা নাটক লেখবার। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতিনাট্য, অর্থাৎ যে নাটকের সবটাই গানে বলা। বিলাত থেকে ব্যালে, অপেরা দেখে এসেছেন, বিলাতী গান শিখে এসেছেন—বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' পড়েছেন, —এ সবের ছাপ পড়লো এর উপর। বিশ বৎসর বয়সের লেখা এই নাটক এখনও অচলিত হয়নি। এই নাটকের শেষে সরস্বতী

এসে বাল্মীকিকে বীণা দিয়ে যা বলেছিলেন সে কি এই বালক সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ?—

'আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান,
তোর গানে গলে যাবে সহস্র পাষাণ প্রাণ।
* * *
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর,
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত,
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার,
যে গান গাহিতে সাধ, ধ্বনিবে ইহার তার।

বিদ্বজ্জন সভার উৎসবে এই অভিনয় দেখবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি অনেকেই এসেছিলেন। সকলেই সুখী। গুরুদাস গান লিখলেন—

"উঠেছে নবীন রবি, নবজগতের ছবি
নব 'বাল্মীকি প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।"

রাজকৃষ্ণ রায় একটা কবিতা লিখলেন। হরপ্রসাদের 'বাল্মীকির জয়' গল্পে তরুণ কবির নাট্যের ছায়া পড়লো।

কবির 'ভগ্নহৃদয়' কাব্য আজকাল কেউ বড় পড়ে না, কবি নিজেই সেটাকে অচলিত করেছেন। কিন্তু সে যুগে অনেকেরই এ কাব্য ভালো লাগত। ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের প্রিয়তমা প্রধানা মহিষীর অকালমৃত্যুর পর 'ভগ্নহৃদয়' তাঁর হাতে পড়ে। কাব্যটি পড়ে তাঁর এতই ভালো লাগে যে তিনি তাঁর খাস-মুন্সিকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন তরুণ কবির সঙ্গে দেখা করবার জন্য— 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যগ্রন্থ মহারাজকে প্রীত করেছে—এই কথাটি তিনি

জানিয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যের সঙ্গীদের মধ্যে সাহিত্যের সত্যকার জহুরি প্রিয়নাথ সেন এ কাব্য পড়ে আদৌ খুশি হননি। তবে তিনি 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' পড়ে রবিপ্রতিভার স্পষ্ট আভাস পেলেন।

রবীন্দ্রনাথের কর্মহীন দিন কাটে কখনো চন্দননগরের গঙ্গার তীরে জ্যোতিদার সঙ্গে, কখনো তাঁদের সাথেই ভাড়াটিয়া বাড়িতে, কখনো মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে বোম্বাই প্রদেশে। এই না-ঘরকা না-ঘাটকা জীবন যাপনের সময়ে লেখেন সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীত, বউঠাকুরাণীর হাট নামে উপন্যাস। এ ছাড়া ছোটখাট প্রবন্ধও আছে। সন্ধ্যা-সঙ্গীত প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যখানি পড়েন, রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহ-সভায়— "দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন। রমেশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিম-বাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য—রমেশ তুমি সন্ধ্যা-সঙ্গীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন 'না'। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

সন্ধ্যা-সঙ্গীত 'হৃদয়ারণ্য' মধ্যে বিচরণ। সেই হৃদয়-অরণ্য থেকে একদিন তাঁর 'নিষ্ক্রমণ' হলো 'প্রভাত-সঙ্গীত' গেয়ে। তখন রবীন্দ্রনাথ থাকেন সদর স্ট্রীটের এক বাসাবাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে।

"এখানে একটু একটু করিয়া 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও একটি 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' লিখিতেছি, এমন সময় আমার মধ্যে একটা কি ওলটপালট হইয়া গেল।....দেখিলাম,একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন। আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেই দিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই

যেন উৎসারিত হইয়া চলিল।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অনুভূতির কথা তাঁর সাহিত্যে নানা সময়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ এটা তাঁর জীবনের একান্ত সত্য অনুভূতি।

এতো আনন্দ কলকাতার সদর রাস্তার বাসায় যদি পাওয়া যায়, তবে দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে আরও কত বেশি করে পাওয়া যাবে। জ্যোতিদাদার সঙ্গে গেলেন দার্জিলিঙ—কিন্তু সে ধ্বনি আর শুনলেন·না, শুনলেন 'প্রতিধ্বনি' মাত্র।

জীবনে এখনো কাজের খুঁটিতে বাঁধা পড়েন নি—তাই চললেন তখনকার বোম্বাই প্রদেশের কারোয়ার—আরবসাগর তীরের শহরে —সেখানে আছেন মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ। এখানেই লেখেন তাঁর প্রথম নাট্যকাব্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'—যা গানে ঢালা নয়। এই নাট্যকাব্যে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রথম আভাস পাই। একটি অন্তর্বিষয়ী ভাবনা—'সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর', অপরটি বহির্বিষয়ী—'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়'। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাট্যকাব্যে এই দুই আইডিয়া সর্বপ্রথম রূপ নেয়। একটি রূপ ব্রহ্মের বা বৃহতের, ভূমার বা বিশ্বচরাচরের ধ্যান, অপরটি জগৎ বা সংসারের, যা সদাই চলছে, সরে সরে যাচ্ছে; এ তত্ত্ব জেনেও সংসারের জন্য কাজ করা। অদ্ভুত সমস্যা প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে এই নাটকে।

কারোয়ার থেকে ফিরে আছেন সার্কুলার রোডের একটা ভাড়া বাড়িতে জ্যোতিদাদের সঙ্গে। দোতলার জানালা দিয়ে দেখা যায় লোকালয়।

"তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কাজ, বিশ্রাম, খেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভালো লাগিত—সে যেন আমার কাছে বিচিত্র গল্পের মতো হইত।"

কবি লিখছেন 'ছবি ও গান' কাব্য। "আমার ছবি ও গান আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম।....আমার সমস্ত বাহ্য লক্ষণে

এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত।....আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। আমি জানতুন না আমি কোথায় যাচ্ছি।”....

উড়িতেছে কেশ উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি মুখে লয়ে হাসি
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হাসিত,
যৌবন মুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।

বয়স এখন বাইশ বৎসর—বিবাহের ব্যবস্থা হলো। এমন বনেদী ঘরে, এমন সুরূপ পাত্রের জন্য পাত্রীর অভাব ছিল না—কিন্তু মেজো ও নতুন বৌঠানরা মিলে খুলনা জেলার একাদশ বছরের গ্রামের মেয়ে পছন্দ করে এলেন—কন্যার পিতা ঠাকুর এস্টেটে সামান্য কর্মচারী। বিবাহ হলো জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই—মেয়ের ছিল সেকেলে নাম—বদলে হলো মৃণালিনী। ইনি হলেন কবির জীবনসঙ্গিনী।

কিন্তু ‘হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে’। বিবাহ উৎসবের দিনই শিলাইদহে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হলো। আর বিবাহের তিনমাস পরে তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথ মারা গেলেন বহু সন্তান রেখে, আরো দুইমাস পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী নিঃসন্তান কাদম্বরী দেবী আত্মঘাতিনী হলেন। এই শেষ মৃত্যুশোকটা রবীন্দ্রের দারুণভাবেই লাগে। ইনি শুধু বউঠাকরুন ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবির সকল কাব্যপ্রেরণার উৎস—একাধারে জননী ও ভগিনীর সমাবেশ হয়েছিল তাঁর মধ্যে। সারা জীবন তাঁর উদ্দেশে কতো

কবিতা, কতো গানই না লিখেছেন, কত বই তাঁর নামে উৎসর্গ উপহার করেছেন। 'পুষ্পাঞ্জলি' দেন তাঁহারই উদ্দেশে—

"হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন।....যে সব লেখা তুমি এত ভালবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গে যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছে বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের সম্বন্ধ নাই!....যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতেরো বৎসরের খেলাধূলা, সতেরো বৎসরের সুখদুঃখ, সতেরো বৎসরের বসন্ত বর্ষা।....আমি কেবল ভাবিতেছি, এমন তো আরো সতেরো বৎসর যাইতে পারে।

....কত শত দিন রাত্রি একে একে আসিবে, কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে।"

সেই সময়ে একটি কবিতায় লেখেন—

'হায় কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায় কোথা যাবে!....
স্নেহের পুতলি তুমি,
সহসা অসীমে গিয়ে কার মুখে চাবে।
হায় কোথা যাবে!'

এই 'পুষ্পাঞ্জলি' লেখার চল্লিশ বৎসর পরে 'লিপিকা' কথিকার মধ্যে এইভাব প্রকাশ পেয়েছে—আরো কত কবিতায় কত গানে।

মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে মংপুতে বৃদ্ধ বয়সে রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরী দেবীর কথা অনেক হতো। মৈত্রেয়ী দেবী লিখছেন—"বিস্মিত মনে তাই ভাবি এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পর যে স্নেহের স্মৃতি এমন

ওতপ্রোতভাবে তাঁর জীবনে জড়িয়ে ছিল....সে না জানি কি প্রভাব-মণ্ডিত ছিল।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মন এক জায়গায় অদ্ভুতভাবে নিরাসক্ত ছিল—তাঁর মতে 'ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ।' তাই মনকে যেন বললেন—

হেথা হতে যাও, পুরাতন।
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে।
আবার বাজিছে বাঁশি, আবার উঠিছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
কী দেখিতে আসিয়াছ! যাহা কিছু ফেলে গেছ....
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে,
হেথায় আলয় নাহি; অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

বিস্মৃতি ও অনাসক্তি এ ছুটোই মহৎগুণ, নইলে স্মৃতিভারে জর্জরিত মনে নূতনের অভ্যুদয় হয় না। কবিদের মন অনাসক্তির উপাদানে গড়া বলেই সাহিত্যসৃষ্টি অব্যাহত থাকে।

সমস্ত অবসাদ, শোক দূর হলো যখন 'বালক' পত্রিকার জন্য লেখা সরবরাহের দায় চাপল ঘাড়ে—আর মহর্ষিও ভার দিলেন আদি ব্রাহ্ম-সমাজ পরিচালনার, সমাজের সম্পাদক পদ গ্রহণ করতে হল রবীন্দ্রনাথকে। সাহিত্যের সেবা ও সমাজের সেবা চলল যুগপৎ—নতুন মানুষ বের হয়ে এল! শুধু ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ নয়—মহর্ষি বললেন, জমিদারির কাজ দেখতে হবে—তার জন্য তৈরি হও।

দ্বিতীয় স্তবক

(১৮৮৪—১৯০১)

১৮৮৪ সাল। রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন প্রায় চব্বিশ বৎসর—পূর্ণযৌবনে দৃপ্ত। দিন যায় অলসে বিলসে হাসি-উচ্ছ্বাসে। শোকাঘাতের ম্লানিমা অনেকটা কেটে গেছে। সাংসারিক জীবনে বিচিত্র কাজের মধ্যে নামবার প্রয়োজন দেখা দিল। মহর্ষির বয়স এখন সাতষট্টি বৎসর, প্রায় চল্লিশ বৎসর সংসার ও সমাজের ভার বহন ক'রে আসছেন। কিন্তু নানা সমস্যা ঘনিয়ে উঠছে—যা' একাকী তাঁর পক্ষে আর সামলানো সম্ভব নয়। ব্রাহ্ম-সমাজের দুর্দিন, কেশবচন্দ্র সেনের অকাল-মৃত্যু হয়েছে। মহর্ষি দেখলেন, এ অবস্থায় আদি ব্রাহ্ম-সমাজকে সুগঠিত করতেই হবে। তাই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক পদ দিলেন জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথকে, আর আদিসমাজের সম্পাদক করে দিলেন কনিষ্ঠপুত্র রবীন্দ্রনাথকে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নূতন প্রেরণা নিয়ে নামলো, প্রাগ্রসরী ব্রাহ্মদের সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' নব্যহিন্দুদের সঙ্গে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই সব পত্রিকায় ধর্ম, সাকার-নিরাকার উপাসনা, আর্যামি, বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে চলে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, এমন কি কটুভাষণ। এই মসীযুদ্ধের একটা খণ্ডপালা হয়ে যায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মধ্যে। বঙ্কিম লেখেন—

"রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী সুশিক্ষিত সুলেখক মহৎস্বভাব এবং বিশেষ প্রীতিবস্তু এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই একটি কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শোনাই আমার কর্তব্য, তবে যে কয়পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'জীবন-স্মৃতি'তে—

"এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখে, শ্লেষপূর্ণ কবিতা ও ব্যঙ্গকৌতুক লিখে প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করছেন—

ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে,
ছুঁচলো সব জিবের ডগা কাঁটার মত গায়ে ফোটে।
তাঁরা বলেন, 'আমি কল্কি'—গাঁজার কল্কি হবে বুঝি
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলি ঘুঁজি।

চন্দ্রনাথ বসু ছিলেন এককালে কিছু-না-মানা তরুণদের দলপতি, তারপর এখন তিনি শশধর তর্ক-চূড়ামণির পাল্লায় পড়ে বিশ্বাস করেন না—এমন বিষয় নেই—

"রব উঠেছে ভারতভূমে হিঁদু মেলাই ভার
দামুচামু দেখা দিয়েছেন, ভয় নেইক আর
ওরে দামু, ওরে চামু!
নাইকো বটে গোতম অত্রি, যে যার গেছে সরে,
হিঁদু দামু চামু এলেন কাগজ হাতে করে।
আহা দামু, আহা চামু!....
দামু চামু কেঁদে আকুল কোথা হিঁদুয়ানি।
ট্যাঁকে আছে, গোঁজ যেথায় সিকি দুয়ানি।
খোলের মধ্যে হিঁদুয়ানি।
দামু চামু ফুলে উঠল হিঁদুয়ানি বেচে,
হামাগুড়ি ছেড়ে এখন বেড়ায় নেচে নেচে।
ষেটের বাছা দামু চামু।"

কিন্তু এ ধরনের হালকা লেখা লিখে তিনি কর্তব্য শেষ করলেন না। ব্রাহ্মধর্মমতকে সমর্থন করে লিখলেন 'রামমোহন রায়' সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ। রামমোহন সম্বন্ধে এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ। রামমোহন ছিলেন কবির আদর্শ—'ভারতপথিক রামমোহন' সম্বন্ধে কত কবিতা, কত প্রবন্ধ তার পর লিখেছেন।

ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বা ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে আলোচনার বাইরে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে পাই 'বালক' মাসিক পত্রের মাঝে। মেজো বউ-ঠাকরুন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী পত্রিকার সম্পাদিকা থাকলেও রবিকেই লিখতে হতো বারো আনি—আর কাজ করতে হতো পনরো আনি—কারণ রবির মত নির্ঝঞ্ঝাটে, বেকার আর কে আছে!

কী না লিখেছেন—কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, তাছাড়া ছোট গল্প 'মুকুট' ও বড় উপন্যাস 'রাজর্ষি'। আর লিখেছেন হেঁয়ালি নাট্য। বাংলা সাহিত্যে একেবারে নূতন সম্পদ এনে দিলেন।

"সূর্যের আলো নহিলে গাছ ভালো করিয়া বাড়ে না, আমোদ-প্রমোদ না থাকিলে মানুষের মনও ভালো করিয়া বাড়িতে পারে না।....বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ মাত্রকেই আমরা ছেলেমানুষী জ্ঞান করি। বিজ্ঞ লোকের, কাজের লোকের পক্ষে সেগুলো নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা আমরা বুঝি না যে, যাহারা বাস্তবিক কাজ করিতে জানে তাহারাই আমোদ করিতে পারে।"

সাহিত্যিক বন্ধুদের মজলিশ বসে—কখনো মথুর সাহার গলিতে প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে, কখনো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁর ঘরটিতে।

'বালক' পত্রিকা এক বৎসর চলে বন্ধ হয়ে গেছে। "আমি-ব্যক্তির হাতে এখন কোন কাজকর্ম নেই....এতদিন মাথার উপরে 'বালক' কাগজের বোঝাটা থাকাতেই মাথা যেন রুদ্ধ হ'য়ে ছিল—নেশা একেবারে ছুটে গিয়েছিল—এখন সমস্ত খোলসা....। কলকাতা শহর, পোলিটিক্যাল এজিটেশন—বসন্তকালে এতো সহ্য হয় না।"

কিন্তু সহ্য হলো। কলকাতায় কংগ্রেস (১৮৮৬) রবীন্দ্রনাথকে গান রচনা করে সেখানে গাইতে হলো—

“আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় ব'লে ওই ডাকছে কে,
সেই গভীরস্বরে উদাস করে—আর কে কারে ধরে রাখে॥”

কিন্তু এসব তো আর কবিমূর্তি নয়। তাঁর কবিসত্ত্বার প্রকাশ-বেদনা রূপ নিল নূতন কাব্যধারায়।

“যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। ‘কড়ি ও কোমল’ আমার এই নব যৌবনের রচনা। আত্ম-প্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম।”

কবিতা লিখে, গান গেয়ে, মজলিস করে দিন যাচ্ছে বটে, কিন্তু মহর্ষির ব্যবস্থায় রোজ বসতে হয় জমিদারী সেরেস্তায়—কাজকর্ম শিখতে হয় নায়েব, ম্যানেজারদের কাছ থেকে। তাঁকেই যে জমিদারীর কাজকর্ম দেখতে হবে। কিন্তু মন পালাই-পালাই করে।

“বাল্যকাল থেকে পশ্চিম ভারত আমার কাছে রোমান্টিক কল্পনার বিষয় ছিল।....অনেক দিন ইচ্ছা করেছি এই পশ্চিম ভারতের কোনো এক জায়গায় আশ্রয় নিয়ে ভারতবর্ষের বিরাট বিক্ষুব্ধ অতীত যুগের স্পর্শ লাভ করব মনের মধ্যে।....শুনেছিলুম গাজিপুরে আছে গোলাপের ক্ষেত।....তার মোহ আমাকে প্রবলভাবে টেনেছিল।”

বিবাহের পর বরাবরই আছেন মেজদাদার সংসারে—এবার গাজিপুরে চললেন সপরিবারে—অর্থাৎ বালিকা বধূ ও শিশুকন্যা সঙ্গে নিয়ে।

“সেখানে গিয়ে দেখলুম ব্যবসাদারদের গোলাপের ক্ষেত—এখানে বুলবুলের নিমন্ত্রণ নেই, কবিরও নেই। হারিয়ে গেল সেই ছবি।”

তবু এই গাজিপুরেই রয়ে গেলেন। কলকাতার পরিবেশ থেকে দূরে, নূতন আবেষ্টনীতে মুক্তি এলো মনোরাজ্যে—কবিতাও নবদেহ ধারণ করলো। এই কাব্য হলো 'মানসী'। মানসী কাব্য তিন-চার বছরের সংগৃহীত কবিতা, কিন্তু মানসী সম্বন্ধে কবি যখনই আলোচনা করেছেন, তখন দু'মাস গাজিপুর বাসকালে রচিত কবিতার কথাই বলেছেন।

এই গাজিপুরে কবিতার 'নিষ্ফল উপহার' কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে তাঁর প্রতিবেশী ইংরেজ সিভিল সার্জেনকে শোনান, এই হলো তাঁর প্রথম ইংরেজি রচনা।

'জীবন আছিল লঘু প্রথম বয়সে', গাজিপুর থেকে ফিরেছেন। কোনো দায় নেই—পত্রিকার চাহিদা নেই। 'সখি সমিতি' নামে মহিলা প্রতিষ্ঠান কলকাতার অভিজাত পরিবারের সমিতি। তাঁদের ফরমাশে কবি লিখে দিলেন 'মায়ার খেলা' গীতি-নাট্য। অভিনয় হলো বেথুন কলেজে—নায়ক-নায়িকা, দর্শক—সবই মেয়েরা।

এবার চললেন সোলাপুর—বোম্বাই প্রদেশে মেজদাদার কাছে। মেজো বৌঠানের হেপাজতে স্ত্রী কন্যা রেখে নিশ্চিন্ত।

'মানসী'র কাব্যধারা চলছে—তারই মাঝে লিখলেন তাঁর প্রথম পঞ্চাঙ্ক নাটক 'রাজা ও রাণী'। এককালে এই নাটক কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতো।

সোলাপুর থেকে ফেরবার পর মহর্ষি এবার রবিকে ভালো করে কাজের ডোরে বাঁধবার ব্যবস্থা করলেন। জমিদারীর কাজকর্ম তো শেখা শুরু হয়েছে—এবার হাতে-কলমে কাজ করবার জন্য পাঠালেন উত্তর-বঙ্গের জমিদারিতে।

"শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগান আছে। প্রকাণ্ড চর—ধূ ধূ করছে—কোথাও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা

যায়—আবার অনেক সময়ে বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়।....পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়।" (ছিন্নপত্র। শিলাইদহ, ১৮৮৮)

মাঘোৎসবের সময় কলকাতা ঘুরে, এবার গেলেন সাহাজাদপুরের জমিদারী কাছারিতে। এখানে বসে লিখলেন 'বিসর্জন' নাটক—রাজর্ষি গল্পের কিছুটা নিয়ে। এ নাটকটিও পঞ্চাঙ্ক এবং 'রাজা ও রাণী'র ন্যায় সমিল প্রবহমান ছন্দে লেখা।

উৎসর্গ করলেন ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে—

"তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ'খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ক কোটরবাসী চিন্তা কীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে, হৃদয়ে স্মরণ করে
লিখিয়াছি নির্জন প্রভাতে
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।"

সাহাজাদপুর থেকে 'বিসর্জন-এর খসড়া নিয়ে কলকাতায় ফিরে দেখেন—শিক্ষিতদের মহলে খুব উত্তেজনা—বড়লাটের মন্ত্রণা-সভায় সদস্য মনোনীত হবে, না নির্বাচিত হবে—এইটাই আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ 'মন্ত্রী অভিষেক' নামে এক প্রবন্ধ লিখে এমারেল্ড থিয়েটারে পড়লেন—রাজনীতি সম্বন্ধে কবির এই প্রথম ভাষণ।

পঞ্চাশ বৎসর পরে কবি লেখেন—

"যখন 'মন্ত্রী অভিষেক' লিখেছিলুম—তখন রাজদ্বারে আমাদের ভিক্ষার দাবি ছিল অত্যন্ত সংকুচিত। আমরা ছিলুম দাঁড়ের কাকাতুয়া, পাখা ঝাপটিয়ে চেঁচাতুম, পায়ের শিকল আরো ইঞ্চিখানেক লম্বা করে দেবার জন্যে। আজ বলছি, দাঁড়ও নয়, শিকলও নয়—পাখা

মেলব অবাধ স্বরাজ্যে। তখন এই ইঞ্চি দুয়েকের মাপের দাবি নিয়েও রাজপুরুষের মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি সেই চোখরাঙানির জবাব দিয়েছিলুম গরম ভাষায়।”

জমিদারীতে যাওয়া-আসা চলে, মন বসে না কাজে—উড়ু উড়ু করে। সুবিধা পেলেই পলায়ন করেন। একবার কিছুকাল কাটলো বোলপুরের সীমাশূন্য জন-মানবহীন প্রান্তর মধ্যস্থিত শান্তিনিকেতনের দোতলা ঘরে—“মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি। সুতরাং চতুর্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে, সেদিন ত একটা দরজা টুকরো টুকরো করে ভেঙে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত—যে কাণ্ডটা করলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল অরণ্যই তাঁর উপযুক্ত স্থান। ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করার মত সহবৎ শিক্ষা হয়নি।”

“বহুকাল এরকম ঝড় দেখিনি। এখানকার লাইব্রেরিতে একখানা মেঘদূত আছে।”

“অন্ধকার রুদ্ধগৃহে একলা বসিয়া
পড়িতেছি মেঘদূত।....
আজি অন্ধকার দিবা, বৃষ্টি ঝর ঝর,
দুরন্ত পবন অতি, আক্রমণ তার
অরণ্য উদ্যত বাহু করে হাহাকার।
বিদ্যুৎ দিতেছে উঁকি ছিঁড়ে মেঘ ভার
খরতর বজ্র হানি শূন্যে বরষিয়া।”

বোলপুর থেকে শিলাইদহে ঘুরে চললেন—সোলবাপুর মেজদাদার কাছে। সেখানে গিয়ে শোনেন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু লোকেন পালিত ফার্লো নিয়ে বিলাত যাচ্ছেন বেড়াতে। রবীন্দ্রনাথ জুটলেন তাঁদের সঙ্গে। এই অকারণে চঞ্চল মনের দিকে তাকিয়ে যেন লিখলেন—

জগৎ বেড়িয়া নিয়মের পাশ
অনিয়ম শুধু আমি।....
বাসা বেঁধে আছে কাছে কাছে সবে
কত কাজ করে কত কলরবে
চিরকাল ধ'রে দিবস চলেছে
দিবসের অনুগামী,
শুধু আমি নিজ বেগ সামলাতে নারি
ছুটেছি দিবসযামী।

কবি যা লিখলেন, তা বর্ণে বর্ণে সত্য।

কোথাকার এই শৃঙ্খল ছেঁড়া
সৃষ্টিছাড়া এ ব্যথা
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, গাহিয়া গাহিয়া
অজানা আঁধার সাগর বহিয়া
মিশায়ে যাইবে কোথা
এক রজনীর প্রহরের মাঝে
ফুরাবে সকল কথা।

যাই হোক সফর তো আড়াই মাসের। তার মধ্যে ইংলণ্ডে একমাস, আর পথে স্টীমারে যেতে-আসতে দেড়মাস। কিন্তু এই সফর থেকে বাংলা সাহিত্য পেলো কয়েকটা ভালো প্রবন্ধ—যার মধ্যে সর্বপ্রথম কবি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিশ্লেষণ করেছিলেন। আর পেলো 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'। দিনের পর দিন এমন তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ রোজনামচা কবি আর কখনো পূর্বে বা পরে লেখেননি।

বাংলাদেশে তখন সাপ্তাহিক কাগজ ছিল—'বঙ্গবাসী' ও 'সঞ্জীবনী' —প্রথমটি গোঁড়া হিন্দুদের, দ্বিতীয়টি গোঁড়া ব্রাহ্মদের মুখপত্র। দল নিরপেক্ষ সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' বের করলেন কয়েকজন সুধী—যৌথভাবে শেয়ারের টাকা তুলে। রবীন্দ্রনাথের উপর ভার পড়লো

সাহিত্যিক দিকটা দেখবার। পত্রিকার চাহিদায় ছোটগল্পে হাত দিলেন, ছয় সপ্তাহে ছটা। জমিদারীতে বাসকালে অভিজ্ঞতার স্পর্শ রয়ে গেছে কয়েকটি গল্পের মধ্যে, বাল্যস্মৃতি মন্থন করেও কিছু লেখা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ চান সাপ্তাহিকের জন্য আরও সারবান্ রচনা। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বিষয়ে কারও ফরমাশ খাটার মানুষ নন,—তাই সরে এলেন।

জমিদারীতে যেতে হয় নিয়মিত ভাবে। নদীবক্ষে নৌকায় বাস।

"বাস্তবিক পদ্মাকে আমি বড় ভালবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি পদ্মা—আমার যথার্থ বাহন—খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনো রকম, কিন্তু ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে।....আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো।"

কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথ?—জমিদারীতে থাকতে থাকতে কত প্রশ্ন ওঠে মনে।

"ঘণ্টা খানেক দুরূহ রাজকার্য সম্পন্ন করে এইমাত্র আসছি। আমার মনে মনে হাসি পায়—আমার নিজের অপার গাম্ভীর্য এবং অতলস্পর্শ বুদ্ধিমানের চেহারা করে সমস্তটা প্রহসন বলে মনে হয়।....আমি এই চৌকির উপর বসে বসে ভান করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি স্বতন্ত্র সৃষ্টি....। আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না।....আমাকে এখানকার প্রজারা যদি ঠিক জানত, তা'হলে আপনাদের একজন বলে চিনতে পারত, সেই ভয়ে সর্বদা মুখোশ পরে থাকতে হয়।"

প্রজাদের জন্য কবির কী দরদ, তাদের আর্থিক, নৈতিক, শৈক্ষিক উন্নতির জন্য তিনি সারা জীবন কত ভেবেছেন, লিখেছেন ও কাজ করেছেন—তা বলতে গেলে একটা বই হয়ে যাবে।

ঠাকুর পরিবারের জমিদারী উত্তরবঙ্গ ছাড়া উড়িষ্যাতেও ছিল—রবীন্দ্রনাথকে সে-সব তদারক করার কথা। কি একটা জরুরী কাজে

হঠাৎ তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়। তখন দক্ষিণপূর্ব রেলপথ তৈরি হয়নি, যেতে হয় স্টীমারে ও নৌকায়—নদীতে নদীতে, খালে খালে।

"স্টীমারের সর্বত্রই কয়লার গুঁড়ো এবং মলিনতা, মধ্যাহ্নের অসহ্য উত্তাপে সর্বশরীর বাষ্পাকুল হয়ে উঠেছে।....একটা সুঁড়িখালের মধ্যে জাহাজ আটকে কাল বিকাল থেকে আজ ন'টা পর্যন্ত যাপন করা গেছে। সমস্ত যাত্রীর ভিড়ের মধ্যে ডেকের একধারে নির্জীব এবং বিমর্ষ ভাবে শুয়েছিলুম....শূন্যে মশা এবং চতুষ্পার্শ্বে আরসোলা সঞ্চরণ করছে।"

উড়িষ্যায় ঘুরছেন কখনো নৌকায়, কখনো পাল্‌কীতে। পাল্‌কীতে আধখানা বৈ দেহ ধরে না, কোমর টন্ টন্ করে—পা ঝিন্ ঝিন্ মাথা ঠক্ ঠক্ করে লাগে ছাদে। কী আরামের ভ্রমণ!

এত ঘোরাঘুরির পর পাণ্ডুয়ার কাছারি বাড়িতে কয়দিন নিরালায় কাটে। সেখানে লিখলেন 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্য—অনঙ্গ আশ্রম নামে বহুদিন মনের মধ্যে ঘুরছিল কাহিনীটা। মনের কী প্রশান্তি থাকলে লিরিক কবিতা ও নাট্যকাব্য লিখতে পারা যায় এই পরিবেশে। এটি দেখা গেছে তাঁর জীবন ভর।

উড়িষ্যা থেকে ফিরে দেখেন বাড়ির যুবকরা 'সাধনা' নামে মাসিকপত্র বের করবার আয়োজন করছেন। বলা বাহুল্য তাঁরা সকলেই জানেন—রবিদা', রবিকা', রবিমামা কাগজের কর্ণধার হবেন। হলোও তাই। চারটে বছর 'সাধনা' চলেছিল—শেষ বৎসর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হন। এই চারটে বছর রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। কোথা থেকে এতো সম্পদ উছলিয়ে আসছে। কবিতা, গল্প, সত্যকার ভ্রমণ ডায়ারি, কাল্পনিক পঞ্চভূতের ডায়ারি, বিচিত্র প্রবন্ধ, পুস্তক সমালোচনা, প্রসঙ্গকথা বা সমকালীন ঘটনা নিয়ে মন্তব্যাদি বের হয়। এসব লেখার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী হয়ে আছে পঞ্চভূতের ডায়ারি ও ছোটগল্পগুলি।

কবির ছোটগল্পের সংখ্যা ৯০টি—তার মধ্যে চার বৎসরের সাধনায় প্রকাশিত ৩৬টি।

পত্রিকার নিত্যনৈমিত্তিক চাহিদা মেটানো ছাড়া কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের চাহিদায় তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য 'গোড়ায় গলদ' প্রহসন লিখতে হয়। সংগীত সমাজে তার অভিনয় হয়। রবীন্দ্র-নাথ প্রায় প্রতিদিনই জোড়াসাঁকো থেকে রিহার্শালে যান—কখনো হেঁটে, কখনো ছ্যাকরা ঘোড়ার গাড়ি করে। বিলাত-ফেরত বাঙালি সাহেবদের অভিনয় শেখানো, উচ্চারণ শুদ্ধ করানো, ভাবভঙ্গি দেখানো—সে এক দুরূহ কাজ। সবই করেন আনন্দের সঙ্গে।

অভিনয়ের দিন শেষ দৃশ্যে নায়কদের মধ্যে একজন বললেন যে, রবিবাবু এখনি তাঁদের মজলিশে আসছেন। সত্যই রবীন্দ্রনাথ স্টেজে উঠে কোমরে চাদর জড়িয়ে হাততালি দিতে দিতে গান ধরলেন—

"ওগো তোমরা সবাই ভালো
যার অদৃষ্টে যেমন জুটেছে, সেই আমাদের ভালো—
আমাদের এই আঁধার ঘরের সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো।
কেউ বা অতি জ্বলো-জ্বলো, কেউ বা ম্লান ছলোছলো
কেউ বা দহন করে, কেউ বা স্নিগ্ধ আলো।........
যে মূর্তিতে জাগো সবই আমার ভালো লাগে,
কেউ বা দিব্যি গৌর বরণ, কেউবা দিব্যি কালো।"

কলকাতার মজলিশী আবহাওয়া ছেড়ে আবার উড়িষ্যায় জমিদারী তদারকে, সঙ্গে তরুণ বলেন্দ্র। কটকে উঠেছেন বি. এল. গুপ্ত জেলাজজের বাড়ি। বেশ ভালো লাগছে তাঁদের আতিথ্য। স্ত্রীকে লিখছেন—

"বিহারীবাবুর অনেকটা আমার মতো ধাত আছে দেখলুম। তিনি সকল বিষয়ে ভারি ব্যস্ত এবং চিন্তিত হয়ে পড়েন।....তিনি আমার

মতো খুঁতখুঁত খিট্ খিট্ করেন না। সেটা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটা মহা সুবিধে....এরকম স্বামী আমার বোধহয় পৃথিবীতে দুর্লভ।"

কটক থেকে পুরী চলেছেন ঘোড়ার গাড়িতে—রেলপথ তখনো নির্মিত হয়নি—আর মোটর গাড়ি তো অজ্ঞাত।

"যত পুরীর নিকটবর্তী হচ্ছি তত পথের মধ্যে যাত্রীর সংখ্যা বেশি দেখতে পাচ্ছি। ঢাকা গরুর গাড়ি সারি সারি চলেছে। রাস্তার ধারে গাছের তলায়, পুকুর পাড়ে লোক শুয়ে আছে, রাঁধছে, জটলা ক'রে রয়েছে।....হঠাৎ একটা জায়গায় গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে সুবিস্তীর্ণ বালির তীর এবং ঘন নীল সমুদ্রের রেখা দেখতে পাওয়া গেল!" পুরীতে বিহারীলালের সঙ্গে সার্কিট হাউসে উঠলেন....

"পুরীতে এসে পৌঁছে সামনে অহর্নিশি সমুদ্র দেখছি, সে-ই আমার সমস্ত মন হরণ করেছে।"

পুরী, ভুবনেশ্বর ও কোনার্কের মন্দির দেখে—

"মনে হইল, একটা যেন কি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম! বেশ বুঝিলাম এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে, সে-কথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।"

জমিদারীর জায়গাগুলি ঘুরতে হচ্ছে নৌকায়, জমিদারীকাছারিতে, কবিতা লিখা চলছে। কিন্তু—

"আমার আর ভ্রমণ করতে ইচ্ছে করছে না। ভারি ইচ্ছা করে একটি কোণের মধ্যে আড্ডা ক'রে একটু নিরিবিলি হয়ে বসি।....ঘরের কোণও আমাকে টানে, ঘরের বাহিরও আমাকে আহ্বান করে। খুব ভ্রমণ করে দেখে বেড়াব ইচ্ছে করে, আবার উদ্‌ভ্রান্ত শ্রান্ত মন একটি নীড়ের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। থাকবার জন্যে যেমন ছোট্টো নীড়টি, ওড়বার জন্যে তেমনি মস্ত আকাশ।"

পুরীর সমুদ্রের স্মৃতি বহন করে পুলকিত মনে ফিরছেন—

"বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে কে বাজাবে সেই বাজনা
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য। বিস্মৃত হবে আপনা,
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ। নব সংগীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণচন্দ্র জাগাবে নবীন বাসনা।"

(বিশ্বনৃত্য)

পদ্মার ধারে ফিরেছেন

"বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন খুব বেড়াচ্ছি। এখানে নির্জন সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখ-দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। এ সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভরা হয়েছিল 'সোনার তরী'তে।"

এখন থেকে কবির কবিতার গতিটা প্রকৃতির ধারা থেকে মানুষের ধাপে উঠছে। পদ্মার ধারেই বেশির ভাগ দিনগুলো কাটছে।

পত্রধারা লিখছেন—যা 'ছিন্নপত্র' নামে পরে ছাপা হয়—সেগুলোকে ডায়ারি বললেও দোষ হয় না। কত কথা মনে আসে, তাই লিপিবদ্ধ করেন।

কিন্তু ভাবনার মোড় ফিরলো কলকাতায় আসাতেই। সেখানে বৃটিশ শাসনের ব্যর্থতা নিয়ে নানা কারণে শিক্ষিতদের মন উত্তেজিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সরকারী 'রায়বাহাদুর' খেতাবধারী লোকও বিরক্ত চিত্তে লিখেছেন—

"যতদিন দেশী-বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্বগৌরব করব, ততদিন জাতি-বৈর শমতার সম্ভাবনা নাই।"

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—'ইংরেজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ, সেটা পড়লেন যে সভায়, সেখানে সভাপতিত্ব করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভাষণে কবি

বললেন—শাসিত ও শাসকের মধ্যে হৃদয়ের যোগ, প্রীতির যোগ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অজ্ঞাত।

"সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না, সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সেদিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে-সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব।"

ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ শমিত করবার উপায়—"ইংরেজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট কর্তব্য সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। ভিক্ষারূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব, তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না। আমাদের অভাবের শূন্যতা না-পূরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই।"

১৮৯৩ সালের এই ভাষণ,—অসহযোগ, আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা ও শিল্পোন্নতির দ্বারা স্বয়ংপূর্ণতা লাভ হচ্ছে ভাষণের মূলকথা।

দেশের সমস্যা নিয়ে মন যেমন ক্ষুব্ধ, বিদেশে দুর্বলের প্রতি অত্যাচার অবিচারের কাহিনী শুনে মন তেমনি ব্যথিত। কোথায় দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ জুলুদের উপর শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশের অন্যায় অত্যাচারের সংবাদ—মাটাবিলি উপজাতির রাজা লবেঙ্গুলো-র রাজ্য ছেড়ে পলায়ন কাহিনী—বাঙালি কবির হৃদয়কে স্পর্শ করে।

"ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লেগেছে কোথা? কা'র শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে। কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়। স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া।"

দিন যায়, মাস যায়। জমিদারী দেখা, 'সাধনা'র নিত্যনৈমিত্তিক বরাদ্দ যোগান দেওয়া চলছে। কলকাতায় থেকে "ভাববার, অনুভব করবার, কল্পনা করবার, মনের ভাব প্রকাশ করবার অবসর এবং উত্তেজনা অল্পে অল্পে চলে যায়, ভিতরে ভিতরে দিনরাত্রির একটা অবিশ্রাম খুঁত খুঁত চলতে থাকে।"

চলে গেলেন বোলপুর। সেখান থেকে এক চিঠিতে নিজের স্বভাব বিশ্লেষণ করে লিখছেন—

"আমার স্বীকার করতে লজ্জা করে এবং ভেবে দেখতে দুঃখবোধ হয়—সাধারণত মানুষের সংসর্গ আমাকে বড় বেশি উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়,—আমার চারিদিকেই এমন একটি গণ্ডী আছে আমি কিছুতেই সে লঙ্ঘন করতে পারিনে।....অথচ মানুষের সঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাও যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক—তাও নয়,—থেকে থেকে সকলের মাঝখানে গিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে।" অ্যারিস্টক্রেট ও ডিমক্রেট দুটোই বাসা বেঁধে আছে—মনের মধ্যে ঘড়ির দোলকের মধ্যে চলাফেরা করে।

সাধনার সম্পাদকী কাজ ভালো লাগছে না। তাকে বিদ্রূপিত করে লিখলেন—

লাগিব দেশের হিতে
গরমে বাদলে শীতে
কবিতা নাটকে গীতে
    করিব না অনাসৃষ্টি।
লেখা হবে সারবান
অতিশয় ধার-বান,
খাড়া রব দ্বারবান
    দশদিকে রাখি দৃষ্টি

রাশি রাশি লিখে লিখে
একেবারে দিকে দিকে
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে
    করিলাম লেখা বৃষ্টি।
ঘরেতে জ্বলে না চুলো
শরীরে উড়িছে ধুলো
আঙুলের ডগাগুলো
    হয়ে গেল কালো কৃষ্টি।

বিদ্রোহী মনে লিখছেন—

আনো গো যৌবন গীতি,
দূরে চলে যাক্ নীতি,
আনো পরানের প্রীতি
    থাক্, প্রবীণের ভাষ্য।
আনো বাসনার ব্যথা
অকারণ চঞ্চলতা
আনো কানে কানে কথা,
    চোখে চোখে লাজ দৃষ্টি।
অসম্ভব, আশাতীত
অনাবশ্য, অনাদৃত
এনে দাও অযাচিত
    যত কিছু অনাসৃষ্টি।

শুধু অসম্ভব, আশাতীতের আহ্বান ক'রে যদি খুশি থাকতে পারতেন, তো ভালোই হতো। কিন্তু অযাচিত, অনাসৃষ্টি কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ও বলেন্দ্রনাথ এখন যুবক—তাঁদের ইচ্ছা ঠাকুর বংশের ধনাগম হয়েছিল যে-পথে সেই ব্যবসায় বাণিজ্যের পথ তাঁরা ধরেন। রবীন্দ্রনাথ ভাইপোদের এই দুঃসাহসিকতায় যোগ দিলেন। কুষ্টিয়ায় পাটের কারবার, ভুষি মালের

কেনা-বেচা, আখমাড়ার কল বানানো প্রভৃতি বিচিত্র কাজ। কবির কী উৎসাহ!

"কর্ম যে উৎকৃষ্ট পদার্থ সেটা কেবল পুঁথির উপদেশরূপেই জানতুম। এখন জীবনেই অনুভব করচি কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা।....যত বিচিত্র রকমের কাজ হাতে নিচ্চি ততই কাজ জিনিসটার 'পরে আমার শ্রদ্ধা বাড়ছে।"

ঘূর্ণচক্র জনতা-সংঘ
বন্ধনহীন মহা আসঙ্গ
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ
আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ
পড়িব নিম্নে চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ
বাহু বাড়াইব তপনে।

খুব উৎসাহের সঙ্গে ঠাকুর কোম্পানির কাজ চালাচ্ছেন। এমন সময়ে মহর্ষি নির্দেশ দিলেন ঠাকুর পরিবারের বিষয় সম্পত্তি যা এজমালিতে চলছিল, তা পার্টিশন করে গগনেন্দ্রনাথ ও হেমেন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। তাঁর হয়তো আশঙ্কা হয়েছিল যে তাঁর পুত্র ও পৌত্রেরা যে ব্যবসায় নেমেছেন, তা যদি লোকসানী কারবার হয়, তবে তা সমগ্র জমিদারীকে আঘাত করতে পারে। এই পার্টিশন করবার জন্য রবীন্দ্রনাথকেই ঘোরাঘুরি করতে হত—কারণ জমিদারীর খুঁটিনাটি আর কে জানে।

এই পার্টিশনের কাজে কবিকে আবার উড়িষ্যায় যেতে হয়। নানা কাজের মধ্যে লিখলেন নাট্যকাব্য 'মালিনী'; গতবার উড়িষ্যাতেই লিখেছিলেন 'চিত্রাঙ্গদা'। 'সোনার তরী'র পর চিত্রা কাব্য এবং তারপর 'চৈতালি' কাব্য লিখেছেন এর পরে। জমিদারীর কাজ ও ব্যবসার

তদারকী করেও অফুরন্ত প্রাণশক্তি উদ্‌বৃত্ত থাকে। নইলে কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের দাবী পূরণ করলেন কেমন করে?

তাঁদের অনুরোধ একটা প্রহসন লেখার জন্য—'গোড়ায় গলদ' তো চার বছর আগে বের হয়েছে—নূতন নাটক চাই। কবি লিখলেন—'বৈকুণ্ঠের খাতা'! তার অভিনয় হলো—কবি নামলেন কেদারের ভূমিকায়।

১৩০৫ সালে 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনের ভার পড়লো তাঁর উপর—এটাতো বাড়ির কাগজ—এতকাল দ্বিজেন্দ্রনাথ, তাঁর ন'দিদি স্বর্ণকুমারী—এঁরাই সম্পাদক ছিলেন। এবার কাজের ভার নিয়ে কত রচনাই যে লিখলেন—তবে এবার রাজনীতিক সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধই বেশি।

আমরা যে পর্বে এসে পড়েছি—১৯ শতকের শেষ দিকে—তখন মহারাষ্ট্রদেশে রাজনীতি সন্ত্রাসকর্মে রূপায়িত হয়েছে। সন্ত্রাসকর্মের প্রথম বলি পড়লো দুইজন ইংরেজ কর্মচারী পুণানগরীর রাজপথে। সমসাময়িক পত্রিকাওয়ালারা আর ঢেকে-চেপে কথা কইছে না। ইংরেজ শাসকদের আসল মূর্তি প্রকট হলো—সিডিশন বিল্ এলো জাতীয়তাবাদের সকল প্রয়াসকে অবরুদ্ধ করার জন্য।

এই সিডিশন বিলের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'কণ্ঠরোধ' নামে ভাষণ পড়লেন টাউনহলে। "সংবাদপত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না।....মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকাশের একটি আচ্ছাদনপট। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্তে বাহির হইয়া পড়িবে।....দুই শত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানব সম্বন্ধের এই কি অবশেষ।"

কবির মতে, "ক্ষমতা যাহার হস্তে, বিচারের শেষ ফল সেই দিতে পারে।....আমরা ক্ষুব্ধ হইলে তাহা রাজদ্রোহ। কিন্তু রাজা রুখিয়া থাকিলে তাহা প্রজাবিদ্রোহ নহে? উভয়েরই ফল কি রাজ্যের পক্ষে সমান অমঙ্গলজনক নহে।" "কঠিন আইন ও জবরদস্তিতে উল্টা ফল" ফলে।

পত্রিকা চালনা ছাড়াও মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আপন সংসারের কথা

ভাবতে হয়। দশ বৎসর জমিদারিতে ঘোরাঘুরি করতে করতে কলকাতার প্রতি তাঁর টান বেশ শিথিল হয়ে গেছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ির আবহাওয়া ভালো লাগছে না। তাই স্ত্রী পুত্র কন্যাদের নিয়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বসবাস করবার জন্য চলে গেলেন—সেখানে সন্তানদের শিক্ষার জন্য ঘরেই ব্যবস্থা করলেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবি, যখন দেশের সম্ভ্রান্তরা তো বটেই, মধ্যবিত্তরা পর্যন্ত গ্রামের বাস উঠিয়ে শহরমুখো হয়েছেন—ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শহরের সংসার গুটিয়ে গেলেন পল্লীগ্রামে !

"নগরের হাটে করিব না বেচা-কেনা,
লোকালয়ে আমি লাগিব না কোন কাজে—
পাব না কিছুই, রাখিব না কারো দেনা,
অলস জীবন যাপিব গ্রামের মাঝে।"

সাহিত্যর নূতন সৃষ্টি হলো—কণিকা, কথা, কাহিনী ও ক্ষণিকা—আটমাসের মধ্যে চারখানা কাব্য।

চন্দ্রনাথ বসু লিখছেন—"তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত, এতই বিদ্যুৎবৎ। তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমন, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।"

ভারতী থেকে এক বৎসরেই মুক্তি নিলেন। 'বর্ষ-শেষ' কবিতায় লিখলেন—

বর্ষ হয়ে আসে শেষ, দিন হয়ে এল সমাপন,
চৈত্র অবসান,
গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন ক্লান্ত বরষের
সর্বশেষ গান।

১৩০৬ সালটা দুর্বৎসর। কুষ্টিয়ার ব্যবসায়ে শনির প্রবেশ হয়েছে বহুকাল। বিশ্বাসী ম্যানেজার ফেরার, বলেন্দ্রনাথ পীড়িত। তারপর ভাদ্রমাসে তাঁর মৃত্যু হলো। সমস্ত চাপ এসে পড়লো রবীন্দ্রনাথের

উপর, নূতন ধার ক'রে পুরাতন ধার শুধছেন—চড়া সুদেও ধার করতে হচ্ছে—উপায় নেই—চালু ব্যবসা ফেলতেও পারছেন না। রাখতেও সাহস হচ্ছে না।

কিন্তু এসব উদ্বেগ অশান্তির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আরেকটি রবীন্দ্রনাথকে—যিনি 'চিরকুমার সভা' লিখছেন। প্রহসনের মধ্যে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ আছে, কিন্তু তার মধ্যে অনেক সমস্যার কথা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন। আর এর সঙ্গে চলছে 'ক্ষণিকার' কবিতা—হাল্কা সুরে, হাল্কা ছন্দে লেখা—কিন্তু ভাবগুলো তার হাল্কা নয়—অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে এই ক্ষণিকের গানের মধ্যে।

'বাহিরে থাকে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে চোখের জল।'

অন্তরের গভীর থেকে আর এক শ্রেণীর গান দেখা দিল—তা 'নৈবেদ্য'রূপে সমর্পিত হচ্ছে প্রতিদিন দেবতার চরণে। বাংলা সাহিত্যে 'ক্ষণিকা' বিশুদ্ধ কাব্যরূপ ও 'নৈবেদ্য' আধ্যাত্মিক কাব্যরূপে তাদের স্থান করে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বয়স ৪০ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে—জীবনের মস্ত একটা সন্ধিক্ষণে উপনীত হয়ে যৌবনকে বিদায় দিলেন—

ওগো যৌবনতরী,
এবার বোঝাই সাঙ্গ করে দিলেম বিদায় করি।
কতই খেলা, কতই খেয়াল,
কতই না দাঁড়-বাওয়া,
তোমার পালে লেগেছিল
কত দক্ষিণ হাওয়া।....
অনেক খেলা অনেক মেলা
সকলি শেষ করে
চল্লিশেরি ঘাটের থেকে
বিদায় দিনু তোরে॥

তৃতীয় স্তবক

(১৯০১—১৯১২)

শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে
অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী।....
স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয়-মন্থন-ক্ষোভে
ভদ্রবেশে বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি,
পঙ্ক শয্যা হতে। লজ্জা সরম তেয়াগি
জাতিপ্রেম নাম ধরি, প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।

বিংশ শতকের গোড়ায় পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কবি দেখছেন—স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত। দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়রদেশ কাড়বার জন্য ইংরেজ লড়ছে—সেখানে আছে হীরের খনি। চীনের মধ্যে হামলা শুরু করেছে প্রায় সব ক'টা শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদী, ব্যবসা-বাণিজ্যে সুবিধা সুযোগ আদায়ের জন্য।

আর আপন দেশের দিকেতাকিয়ে দেখেন—কংকালসার ভারতের অন্য রূপ। তখন প্রার্থনা ওঠে—

এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্বতুচ্ছ ভয়।
লোক ভয়, রাজ ভয়, মৃত্যু ভয় আর।

অখণ্ড জীবনধারায় দেশ ও বিশ্বকে পৃথক করে দেখতে পারেন না কবি—নৈবেদ্যর কবিতারাজির মধ্যে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ।

১৩০৮ সালে। 'বঙ্গদর্শন' নবপর্যায় শুরু হলো রবীন্দ্রনাথকে সম্পাদক করে। বঙ্কিমচন্দ্রের নামের সঙ্গে বঙ্গদর্শনের যোগ, তাই পত্রিকাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার কাজে লাগলেন।.... "সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা—বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্ত ভাবে প্রতিফলিত করা।"

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে তত্ত্বকথা প্রচারের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের জন্য উপন্যাস লেখেন। রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শে সমকালীন সমস্যা, সমাজতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ তো লিখছেন—তার সঙ্গে 'চোখের বালি' উপন্যাস মাসিক কিস্তিতে দিয়ে চললেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস যেমন বঙ্গসাহিত্যে নূতন ধারা এনেছিল, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তেমনি করে বাঙ্গালির সম্মুখে জীবন-সমস্যাকে নূতন করে তুলে ধবলো। প্রসঙ্গক্রমে বলি ঠিক এই সময়ে 'নষ্টনীড়' বের হচ্ছে ভারতীতে (১৩০৮), সে-ও সমস্যামূলক বড় গল্প।

সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখুন, আর উপন্যাসে নর-নারীর বিচিত্র সমস্যা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করুন—পাশাপাশি আছে তাঁর নিজ জীবনের অশেষ সমস্যা—শিলাইদহের বিদ্যালয়ের ভাবনা, জমিদারির খাজনা, দেনা পাওনা। আর যুগপৎ চলছে কুষ্টিয়ার ঠাকুর কোম্পানির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন। সেটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে, তার অস্তিত্বের চিহ্নটুকু পর্যন্ত লোপ করতে চান—সে-যে মনের ওপর দুঃস্বপ্নের মতো চেপে বসে আছে।

এদিকে বড় মেয়ের বিবাহের ভাবনা। কত লেখালেখি, দর-কষাকষি টাকার অঙ্ক নিয়ে। বিয়ের ঘটকালি করছেন তাঁর বন্ধু প্রিয়নাথ সেন। ভালো জামাই জুটলো। বিদ্বান, সুপুরুষ, শান্ত অথচ দৃঢ়চরিত্র। শরৎ চক্রবর্তী—মজঃফরপুরের উকিল।

বড় মেয়ের বিবাহের এক মাসের মধ্যে মেজো মেয়ের বিবাহ হয়ে গেল—এক পত্রে কবি বিলাতপ্রবাসী বন্ধু জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন—"একটি ডাক্তার বলিল বিবাহ করিব—আমি বলিলাম, কর। যেদিন

কথা, তাহার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল। এখন ছেলেটি তাহার অ্যালোপাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক চূড়া চড়াইবার জন্য আমেরিকা রওনা হইতেছে।”

দুই মেয়ের বিবাহ হয়ে গেল—বড় মেয়ে মজঃফরপুর স্বামীঘর করতে গেলেন। শিলাইদহের বাস এবার উঠলো, বড়ছেলেকেও যে পরীক্ষার জন্য তৈরি করতে হবে। কবির ইচ্ছা শান্তিনিকেতনে ‘বোর্ডিং স্কুল’ স্থাপন করবেন, রথীন্দ্র সেখানে থাকবে, আর শিলাইদহে স্ত্রী যেমন ছিলেন—তেমনি থাকবেন।

এ প্রস্তাবে গৃহিণী রাজি হন নি—দুটি বৎসর তো অরণ্যবাস হয়েছে। তখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে এসে বাসা বাঁধলেন। ভাবছেন ‘বোর্ডিং স্কুল’ হবে প্রাচীন কালের তপোবনের গুরুগৃহ।

“মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি পূর্বকালের ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী বালক বালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চ্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হইবে। যেমন কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটু স্থান থাকিবে—যাহা রাজ্য ও সমাজের সকল প্রকার বন্ধন পীড়নের বাহিরে।” এই ভাবনাই ছিল “বিশ্বভারতী” প্রতিষ্ঠা কালে।

১৯০১ সালে ডিসেম্বর ২২-এ (১৩০৮ পৌষ ৭) রবীন্দ্রনাথ পাঁচটি মানবক নিয়ে তাঁর বিদ্যালয় স্থাপন করলেন।

বঙ্গদর্শনের মারফত “ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।....এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সঙ্কল্প এবং খবর পেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়-সংস্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি।....

(ব্রহ্মবান্ধব) তাঁর কয়েকটি শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন। তখনই আমার তরফের ছাত্র ছিল রথীন্দ্রনাথ ও তার কনিষ্ঠ শমীন্দ্রনাথ।”

রবীন্দ্রনাথকে যে ‘গুরুদেব’ বলা হয়, সে-টি প্রবর্তন করেন ব্রহ্মবান্ধব। তবে এখানে একটা কথা বলা উচিত—রবীন্দ্রনাথের ‘গুরুদেব’ নাম ডাকের মধ্যে না-ছিল গুরুত্ব, না-ছিল দেবত্ব। আমরা তাঁকে সহজ মানুষ ভাবেই দেখতাম, আর তাঁর সঙ্গে কর্মীদের প্রভু-মনিবের সম্বন্ধ ছিল না—কাজ হতো গোল টেবিল বৈঠকের মতো—উচ্চ নীচ বোঝা যেতো না সহজে।

ছয় মাস বিদ্যালয় চলার পর দেখা দিল সমস্যা—ব্রহ্মবান্ধব কাজ ছেড়ে চলে গেলেন (১৯০২ জুলাই)। কয়েকটি মানবক নিয়ে শহর থেকে দূরে, উত্তেজনাহীন পল্লীগ্রামের উপকণ্ঠে বরাবর পড়ে থাকার মানুষ তিনি নন। অনেক কাজ—প্রাচীন তপোবনের স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে। বোর্ডিং স্কুলকে ‘বোর্ডিং স্কুল’ রূপেই তাকে স্বীকার করতে হলো—গুরুর স্থানে এলো স্কুল মাস্টার, শিষ্যর স্থানে এলো ছাত্র। আদর্শ ও বাস্তবের বিরোধ বাধলো, এই দ্বন্দ্ব চলে শেষ পর্যন্ত—বোধ হয় এটা আছে বলেই জীবনে প্রগতি হয়।

শান্তিনিকেতনে স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে আছেন। এমন সময়ে স্ত্রীকে ধরলো কাল ব্যাধি—কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হলো, সেখানে তাঁর মৃত্যু হলো (৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯)। তখন মৃণালিনী দেবীর বয়স ত্রিশ বৎসরও পূর্ণ হয়নি—আর রবীন্দ্রনাথের বয়স চল্লিশের কিছু বেশি। সন্তানরা সকলেই নাবালক। কবির এই শোকাঘাত ‘স্মরণ’ কাব্যে অমর হয়ে আছে—

স্বল্পআয়ু এ জীবনে যে-কয়টি আনন্দিত দিন
কম্পিত পুলকভরে, সঙ্গীতের বেদনা-বিলীন,
লাভ করেছিলে, লক্ষ্মী, সেকি তুমি নষ্ট করি যাবে?
সে আজি কোথায় তুমি যত্নে করি রাখিছ কী ভাবে

তাই আমি খুঁজিতেছি। সূর্যাস্তের স্বর্ণমেঘস্তরে
চেয়ে দেখি একদৃষ্টে—সেথা কোন্ করুণ অক্ষরে
লিখিয়াছ সে জন্মের সায়াহ্নের হারানো কাহিনী।
আজি এই দ্বিপ্রহরে পল্লবের মর্মর-রাগিণী
তোমার সে কবেকার দীর্ঘশ্বাস করিছে প্রচার!
আতপ্ত শীতের রৌদ্রে নিজহস্তে করিছে বিস্তার
কত শীতমধ্যাহ্নের সুনিবিড় সুখের স্তব্ধতা।
আপনার পানে চেয়ে বসে বসে ভাবি এই কথা—
কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে।

কিছুকাল পরে লিখিত 'দুর্ভাগা' কবিতায় বলেছেন—

ঝড়ের মুখে যে ফেলেছে আমায়
সেই ভালো, ওগো সেই ভালো।
সব সুখ জালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো।
সাথী যে আছিল নিলে কাড়ি
কী ভয় লাগালে গেল ছাড়ি।
একাকীর পথে চলিব জগতে
সেই ভালো মোর সেই ভালো।

রোগ-সেবা—নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা,—তার মধ্যে আছে সকল রকমেরই কাজ। বোলপুরের বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য এতদিন পরে তার জন্য নিয়ম রচনা করতে হলো, এটাই বোধহয় বিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধান।

বঙ্গদর্শনে—চাহিদা মেটাতে হচ্ছে সময়মতো—'চোখের বালি' যথারীতি প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এদিকে মেজো মেয়ের খুস্‌খুস্

কাসি যা মনে হয়েছিল গলক্ষত মাত্র, তা দেখা দিল যক্ষ্মাকারে। মাতৃহারা কন্যা, পিতার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ডাক্তারের পরামর্শে বায়ুপরিবর্তনের জন্য গেলেন হাজারিবাগে। সেখানে অসুখ-বিসুখ ডাক্তারের অভাবে কী কষ্টই পাচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যেই কবিতার নির্ঝর কেমন করে বের হয়ে আস্‌ছে—তাই ভাবি।

'চোখের বালি' শেষ হয়ে গেছে। "একটা গল্প না ধরলে পাঠকেরা ইটপাটকেল ছুঁড়তে আরম্ভ করবে।"

"বৈশাখের (১৩১০) বঙ্গদর্শনের জন্য একটা বড় গল্পের প্রথমাংশ লিখিয়া" পাঠালেন—শুরু হলো 'নৌকাডুবি' উপন্যাস।

হাজারিবাগে রেণুকার কোনো উন্নতি না হওয়াতে—আবার ডাক্তারের উপদেশে চললেন শীতের দেশে আলমোড়াতে।

"সংসারের তরণীটি নানা প্রকার তুফানের উপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছি—কবে একটা বন্দরে টেনে নোঙর ফেলতে পারব জানিনে। ছেলেদের মধ্যে কেউ একদিকে, কেউ আর এক দিকে, আমার বিদ্যালয় একদিকে এবং আমি আধিব্যাধি নিয়ে অন্যদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছি। বিচ্ছিন্ন সংসারটাকে এক জায়গায় জমাট করে নিয়ে বসবার জন্যে মন ব্যাকুল হয়েছে।"

কিছু কাল থেকে 'কাব্যগ্রন্থ' নূতন ভাবে সম্পাদন করছেন অধ্যাপক মোহিত চন্দ্র সেন। অষ্টমখণ্ডে ছাপা হবে 'শিশু'র কবিতা। পুরানো লেখা থেকে সংগ্রহ করতে করতে কখন মন শিশুর মনোরাজ্যে প্রবেশ করলো—লিখতে শুরু করলেন শিশু-বিষয়ক কবিতা—জমে উঠলো অনেকগুলি—পাঠাচ্ছেন কলকাতায়।

শিশুর সব কবিতাই খোকার জবানী, খুকির উদ্দেশ্যে একটাও নেই কেন—প্রশ্ন করে পাঠান অধ্যাপক মোহিতচন্দ্রের স্ত্রী—তাঁর দুটি কন্যা যে। কবি তার জবাবে লেখেন—

"আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে....খোকা এবং খোকার মা'র মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ মধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার স্মৃতির শেষ

মাধুরী—তখন খুকি ছিল না—মাতৃ-সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল—সেই জন্য লিখতে গেলেই খোকার এবং খোকার মা'র ভাবটুকু সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারিনে।"

শিশুর উদ্দেশ্যে রচিত একটা গান এই সময়েরই লেখা—

তোমার কটি তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া
কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া।
বিহান বেলা আঙিনাতলে এসেছ তুমি কী খেলা ছলে
চরণ ছুটি চলিতে ছুটি পড়িছে ভাঙিয়া।
তোমার কটি তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া।....

কবিতা লেখা, উপন্যাস লেখা, কন্যার সেবা—এই কী শেষ—বোলপুর বিদ্যালয়ে নানা ধরণের অশান্তি—তার ব্যবস্থার কথা ভাবতে হয়—কলকাতায় আসতে হয় সামাজিক কর্তব্য করতে।

আলমোড়ায় কন্যার রোগ বাড়লো—কলকাতায় ফেরবার জন্য মেয়ের জিদ্। রুগ্ন, দুর্বল মেয়েকে নিয়ে এই দীর্ঘ পথ কী কষ্টে যে এলেন, তা বলা যায় না। কলকাতায় ফেরবার কয়দিন পরেই কন্যার মৃত্যু হলো। স্ত্রীর মৃত্যুর নয় মাস পরে সন্তানের মৃত্যুশোক—কিন্তু কোনো প্রকাশ নেই।

বিদ্যালয়ের জন্য দুশ্চিন্তার শেষ নেই—নিজে থাকতে পারছেন না বলে সেখানে কাজকর্ম ঠিকমতো চলছে না। এমন সময়ে এক তরুণ এসে বললেন যে, তিনি বিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করবেন, শান্ত নম্র স্বল্পভাষী সৌম্যদর্শন সতীশচন্দ্র রায়....

"জেনে শুনেই এখানকার সেই অগাধ দারিদ্র্যের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে ছিল প্রসন্ন মনে।" কবির সঙ্গে বয়সের ভেদ ঘুচে গেল—বিদ্যালয়

পেলো আদর্শ শিক্ষক—কবি পেলেন মনের মতন মানুষ—যে তাঁর বাণীকে শুধু কণ্ঠে ধারণ করে নি, জীবনে গ্রহণ করেছিল।

"মনে পড়ে কত দিন তাকে পাশে নিয়ে শাল-বীথিকায় পায়চারি করেছি নানা তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে।"

"কত দিন এই পাতা-ঝরা
বীথিকায়, পুষ্পমঞ্চে বসন্তের আগমনী-ভরা
সায়াহ্নে দুজনে মোরা ছায়াতে অঙ্কিত চন্দ্রালোকে
ফিরেছি গুঞ্জিত আলাপনে। তার সেই মুগ্ধ চোখে
বিশ্ব দেখা দিয়েছিল নন্দন মন্দার রঙে রাঙা।"

আমরা ১৯০৪ সালে এসে পড়েছি। বাংলাদেশে নূতন সমস্যা—বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করছেন বড়লাট লর্ড কর্জন। সিমলা শৈলের গ্রীষ্মাবাসে সাহেবদের সঙ্গে কী গোপন বৈঠক বসলো—তারপর ঢাকা শহরে হলো নবাব বাহাদুরের সঙ্গে কী শলাপরামর্শ। এর পরই বঙ্গচ্ছেদ হবে ব'লে ঘোষণা। বাঙালির আবেদন নিবেদন প্রতিবাদ-সভা চলে সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথ দেশের সমস্যা ও তার প্রতিকার কোথায়, তার স্বচ্ছ বিশ্লেষণ করলেন 'স্বদেশীসমাজ' প্রবন্ধে (১৯০৪, জুলাই)। কবি যা' বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে "ফিরে চল মাটির টানে। যে-মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।" গ্রামের মধ্যে গ্রামের লোকের সঙ্ঘশক্তি বৃদ্ধি করবার আয়োজন করাই যথার্থ কাজ। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টরূপে যে প্রোগ্রামের ছক তৈরি করে দেন তাতে স্পষ্ট বলা হয়—"সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্নমেন্টের শরণাপন্ন হইব না।....ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না।....ক্রিয়াকর্মে ইংরেজ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব।....স্বদেশীচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।" এছাড়া যে সূচী প্রণীত হলো, তা' যেন বর্তমান উন্নয়ন পরিকল্পনার পূর্বাভাস। কিন্তু ঝুনো রাজনীতিকরা বললেন, রবিবাবুর পরামর্শ মতো চললে—রাজনীতির সর্বনাশ।

১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর গবর্নমেণ্ট বাঙালির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য ক'রে বঙ্গচ্ছেদ করলেন। বাঙালি তার জবাবে জানালে—

"আমি পরের ঘরের কিনবো না আর,
ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।"

ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জন নীতি বা বয়কট আন্দোলন শুরু হলো। রবীন্দ্রনাথ এই দেশব্যাপী আন্দোলন ও উত্তেজনায় যোগ না-দিয়ে থাকতে পারলেন না—তিনি যে কবি। এই উত্তেজনার ইন্ধন দিলেন অজস্র গান লিখে। বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,—"আগামী ৩০ আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই, তাহাই বিশেষরূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য এই দিনকে আমরা বাঙালির রাখি-বন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব। রাখি-বন্ধনের মন্ত্র এই, "ভাই ভাই একঠাঁই"। আর রাখি সঙ্গীত লিখলেন—

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।

উত্তেজিত জনতা গান ধরলো—

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে, এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান।"

কবি যে-সব গান লিখলেন—তা বাঙলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়লো। যুবকরা গাইল—

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলরে।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরিয়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানেন বস্ত্র-বর্জন নীতির দ্বারা জাতির নগ্নতা দূর হবে না। তাই কুষ্টিয়াতে তাঁরা বয়নবিদ্যালয় স্থাপন করলেন আর বললেন উত্তেজনার দ্বারা সংগ্রাম করা যায় না।

"দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্মসভার মধ্যে বদ্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব—তাঁহাদের নিকট নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব····নির্বিচারে তাঁদের শাসন মানিয়া চলিব—তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া দেশকে সম্মানিত করিব।"

"আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে।" এই তো পঞ্চায়েত-রাজের বাণী।

শিক্ষায় জাতীয়তা বা জাতীয় শিক্ষার কথা বহুকাল ভাবুকদের মনে এসেছে, কিন্তু রাজনীতিতে ছাত্রদের যোগদান ও সরকারের তাহাতে বাধা দানের ফলে জাতীয় শিক্ষালয় সংস্থাপন ত্বরান্বিত হলো। এখন যা' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত তার উদ্ভব হয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ রূপে ১৯০৬ সালে আগষ্ট মাসে—বয়কট ঘোষণার এক বৎসর পরে। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে গোড়ার দিকে বেশ জড়িয়ে পড়েন—সভায় বক্তৃতা, পরীক্ষায় প্রশ্ন করা, সাহিত্য বিষয়ে ভাষণ দান—সবই করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই বুঝলেন—তাঁর পথ, আর এঁদের পথ ভিন্ন।

ইতিমধ্যে ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে কবি তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র

রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধু-পুত্র সন্তোষচন্দ্রকে আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা পড়বার জন্য পাঠালেন। এদেশে তখন কৃষিবিদ্যা শেখবার আয়োজন হয়নি। তখনকার দিনে ধনীর ছেলেরা বিলাত যেতেন সিবিল সার্বিস পরীক্ষা দিতে বা ব্যারিস্টারি পড়তে, মধ্যবিত্তরা যেতে শুরু করেছে জাপানে। রুশ-জাপানী যুদ্ধে জাপানী বিজয়ী হয়েছে ব'লে সে দেশ ও সে জাত এখন প্রাচ্যের আদর্শ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পাঠালেন কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার জন্য। গ্রামের মধ্যে বাস করে কবি এইটি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য ব্যতীত জনতার উদ্‌বৃত্ত কর্মশক্তির উদ্ভব হবে না, আর উদ্‌বৃত্ত শক্তির উপর জাতির ভবিষ্যতের নির্ভর কৃষির উন্নতি করতে হবে।

রথীন্দ্রনাথদের প্রশান্ত মহাসাগরের পথে আমেরিকা রওনা করে দিলেন কলকাতা থেকে। তারপর চললেন বরিশাল—সেখানে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। তারই সঙ্গে প্রথম সাহিত্য সম্মেলন আহূত হয়েছে—রবীন্দ্রনাথই তার মনোনীত সভাপতি। তিনিই 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' ভাষণে বলেছিলেন :

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে বাংলায় ঐক্যসাধন যজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি।....এই পরিষদকে জেলায় জেলায় আপনার শাখা-সভা সংস্থাপন করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে এক একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাষার ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিয়া, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য করিবার ভার সাহিত্য পরিষদ গ্রহণ করিয়াছেন :

রবীন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবমতো এই সাহিত্য সম্মেলন আহূত হয়েছিল। কিন্তু প্রাদেশিক সমিতি বানচাল হয়ে গেল ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জুলুমবাজিতে—স্বেচ্ছাসেবকদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করার অপরাধে, প্রথম লাঠির ঘায়ে রক্তপাত হলো বরিশালের রাজপথে—বাঙালি ছেলের রক্তের ভয় ভেঙে গেল সেই দিন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন পরিত্যক্ত হলো—এই উত্তেজনা ও অপমানের মধ্যে সাহিত্যের আসর জমতে পারে না।

দেশের রাজনীতিক মতি ও গতি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে—কাজের কাজ সুরু হতে না-হতেই মতভেদ নিয়ে দলাদলি দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ আপন জমিদারীতে গেছেন, দেশবাসীকে বললেন—

"এখন ছোট ছোট অর্গানাইজেসন তৈরী করা উচিত। কিছুদিন হইতে 'পল্লীসমিতি' সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছি....। আমাদিগকে এখন পল্লীর প্যাট্রিয়টিজম্ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা যদি প্রতি পল্লীর সকল অভাবমোচনের ভার নিজেরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে পল্লীকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে পারি।.... আত্মশক্তি চালনা করিয়া কর্তৃত্বের প্রকৃত অধিকারী হওয়ার জন্য এরূপ 'পল্লী-সমিতি'তে আমাদের এখন হাতে-খড়ি করিতে হইবে।"

রবীন্দ্রনাথ 'কবি একথা যেন আমরা ভুলে না যাই, কোনো কিছুর মধ্যে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। রাজনীতির উত্তেজনায় ক্লান্তি এসেছে—মন চলেছে কাব্যশ্রীর ইঙ্গিতে রহস্যা-লোকের দিকে। তাই লিখছেন—

বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই,
কাজের পথে আমি তো আর নাই।
এগিয়ে সবে যাও না দলে দলে,
জয়মাল্য লও না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়া তলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই,
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই।
পথের নেশায় আমায় লেগেছিল
পথ আমারে দিয়ে ছিল ডাক।....

অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।
এখন কেবল একটি পেলেই বাঁচি,
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি,
এখন শুধু আকুল-মনে যাচি
তোমার পারে খেয়ার তরী ভাসা।
জেনেছি আজ চলেছি কার লাগি,
ছেড়েছি সব অকস্মাতের আশা।

কবির বেশিরভাগ দিন কাটে শান্তিনিকেতনে, 'দেহলি' নামে এক কামরার একটা ছোট্ট দোতলা ঘর বানিয়ে নিয়েছেন—সেখানেই থাকেন। গ্রীষ্মের সময়ে ছোট মেয়ের বিবাহ দিলেন—তারপর জামাতাকে পাঠিয়ে দিলেন আমেরিকায় কৃষিগোপালন বিদ্যা অর্জন করতে (১৯০৭)।

সাহিত্যে নূতনত্ব আসছে, বঙ্গদর্শনে নৌকাডুবি শেষ হয়েছে ১৩১২ আষাঢ়ে। তারপর দুটো বৎসর গেছে—দুই একটা ছোট গল্প লিখেছেন। ১৩১৪ সালে বঙ্গদর্শনের সম্পাদকত্ব ছাড়লেন, কিন্তু অচির-কালের মধ্যে 'প্রবাসীর' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তাগিদে প্রথমে লিখলেন 'মাস্টার মশাই' ছোট গল্প—তারপর ভাদ্র (১৩১৪) মাস থেকে শুরু করলেন তাঁর বিরাট উপন্যাস 'গোরা'। প্রায় তিন বৎসর ধারাবাহিক সেটি লিখে চললেন—এর মধ্যে জীবনের কত ঘটনা, এমনকি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে—কিন্তু কোন দিন প্রবাসীর জন্য 'গোরা' উপন্যাসের কিস্তি বন্ধ হয়নি বা দেরিতে পৌঁছয়নি—এমন কি কনিষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর পরমাসেও লেখা ঠিক সময়ে প্রবাসী অফিসে পৌঁছয়।

বাংলাদেশে রাজনীতিক আন্দোলন বানচাল করবার জন্য গবর্নমেণ্ট আইনের একটি একটি ক'রে অস্ত্র বের করছেন। 'বন্দেমাতরম' নামে ইংরেজি কাগজ আইনের জালে আটকা পড়লো, অরবিন্দ ঘোষ

তখন বামপন্থীদের নেতা। বন্দেমাতরমের একটা লেখা নিয়ে সরকার তাঁকে আটকালো। কিন্তু মামলায় প্রমাণ হলো না যে অরবিন্দ সেই রচনার লেখক। মামলা যখন চলছে সেই সময়ে গিরিডিতে বাসকালে অরবিন্দ সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখে কলকাতায় এসে কবি অরবিন্দের হাতে দিলেন—

অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণী-মূর্তি তুমি।···· জয়, তব জয়।
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়।
সত্যেরে করিবে খর্ব কোন্ কাপুরুষ
নিজেরে করিতে রক্ষা ? কোন্ অমানুষ
তোমার বেদনা হতে না পাইবে বল ?
মোছরে দুর্বল চক্ষু, মোছ অশ্রুজল !”

কয়েকদিন পূর্বে আমেরিকায় পুত্রকে লিখেছিলেন—

“স্টেট্স্ম্যান কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে ‘বন্দেমাতরম’ কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে। বোধহয় সে জেল থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। আমাদের দেশে জেলখাটাই মনুষ্যত্বের পরিচয়-স্বরূপ হয়ে উঠচে। জেলখানার ভয় না ঘোচাতে পারলে আমাদের কাপুরুষতা দূর হবে না।”

পূজার ছুটিতে কবি বহরমপুরে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করে এলেন। এসেই খবর পেলেন ছোট ছেলে শমীন্দ্র বন্ধুর বাড়িতে মুঙ্গেরে বেড়াতে গিয়ে কলেরা রোগাক্রান্ত। কবি সেখানে গেলেন, কিন্তু শমীন্দ্র চলে গেলো চোখের আড়ালের দেশে। কয়েকদিন পরে এক পত্রে লিখছেন—

"অল্পদিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এসেছি। এই বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখতে গেলে এটা যত বড় উৎকট আকার ধারণ করে, জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়।.... সমস্ত আঘাত কাটিয়ে জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনি চলছে, হয়তো একটা পরিবর্তন ঘটেছে—কিন্তু সে পরিবর্তন উপর থেকে দেখা যায় না—সে পরিবর্তন নিজের চোখেও হয়তো সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্য গোচর হতে পারে না।"

"শমী যে রাত্রে চলে গেল তারপরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়ছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তের জন্যে আমার কাজও বাকি রইল।"

কবি চলে গেলেন শিলাইদহে। সেখানে মন গেল কল্যাণ-কর্মে। সে কল্যাণ-কর্ম শুরু করলেন তাঁর আশে-পাশের মূক মূঢ় জনতার মাঝে। পল্লী-সমাজের কাজে লাগলেন। কলকাতার এন্টিসার্কুলার সোসাইটির কয়েকজন পূর্ববঙ্গের যুবক এলো কবির কাজে সহায়তা করবার জন্য। গ্রামোদ্যোগের একটা পর্ব সুরু হলো—দীনভাবে সকলের চোখের আড়ালে নিরালা গ্রামের মাঝে।

কবি শিলাইদহে। খবরের কাগজে পড়লেন সুরত কংগ্রেস দক্ষযজ্ঞে পরিণত হয়েছে। সভায় নরমপন্থী ও চরমপন্থী বা মডারেট ও এক্সট্রিমিস্ট দুই দলের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ শেষকালে পাদুকা বর্ষণে পরিণত হয়ে—সভা ভেঙে গেছে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিলাত-প্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন—

"কিছুদিন হইতে গবর্নমেন্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে....যেটুকু উত্তাপ এতদিনে আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল—তাহা নিজেদের ঘরে আগুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে।....এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন

পক্ষ দাঁড়াইয়াছে—চরমপন্থী, মধ্যপন্থী এবং মুসলমান—চতুর্থ পক্ষটি গবর্নমেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচকি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মর্লিও নয়, কিচেনারও নয়—আমরাই নিজেরাই পারিব।”

সুরত কংগ্রেস বানচাল হয়ে যাবার মাস দুই পর (১৯০৮ ফেব্রু.) পাবনায় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন—রবীন্দ্রনাথ মনোনীত সভাপতি। বেনামী চিঠি পাচ্ছেন—পাবনায় কন্‌ফারন্সে সুরত কংগ্রেসের পুনরাবৃত্তি হবে, অর্থাৎ মতভেদ থেকে মাথাভাঙা হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এসব হুমকি অগ্রাহ্য ক'রে সভাপতি পদগ্রহণ করলেন এবং যথা সময়ে পাবনায় উপস্থিত হয়ে ভাষণ পড়লেন। এ-সভার বৈশিষ্ট্য ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণ বাংলায় দিলেন। ১৮৯৫ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সমিতির সবকিছু কাজ ইংরেজিতেই হয়ে আসছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই ধারা পাল্টে দিলেন—জনতার কাছে জনতার ভাষায় কথা বললেন। গণসংযোগের প্রধান ধাপ।

এই ভাষণে ‘স্বদেশী সমাজে’ যা বলেছিলেন সেই কথাই নূতন ভাবে বললেন। গ্রামকে বাঁচাতে হবে,—তার জন্য সমবায়-নীতির প্রচলন, মিতশ্রমিক (Labour-saving) যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ও বিবিধ কুটীর-শিল্পের সমর্থন করতে হবে। আর বললেন, সংঘশক্তি অর্জন ছাড়া স্থায়ী মর্যাদা ও সাফল্য লাভ হবে না।

কোথা থেকে অকস্মাৎ সন্ত্রাসবাদীর রক্ত হস্ত দেখা গেল মজঃফরপুরে। সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করবার জন্য নিক্ষিপ্ত বোমার ঘায়ে মারা পড়লো দুইজন নিরপরাধ ইংরেজ রমণী। হত্যাকারীদের একজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সময়ে আত্মহত্যা ক'রে, অপর জন ধরা পড়ে। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে কলকাতার কাছে খালের ওপারে মানিকতলার এক পোড়ো বাড়িতে একটা বোমার

কারখানা আবিষ্কৃত হলো ও বহু বাঙালি যুবক ধৃত হলো। সমগ্র দেশ এই সংবাদে স্তম্ভিত—বাঙালির ছেলের এতো সাহস!

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : "বহুদিন হইতে বাঙালি জাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায়-অন্যায় ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার প্রতিক্রম করিয়াও অপমান-মোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালির মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হিংসাত্মক পথে রাজনীতি সাফল্যমণ্ডিত হয়—এই মত পোষণ করতেন না। তিনি বললেন, দেশের মুক্তির নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুতর হলেও প্রশস্ত পথ দিয়েই তা মিটাতে হবে—কোনো সংকীর্ণ বা স্বল্প পথ দিয়ে পাওয়া যাবে না। গান্ধীজি এই কথাই জীবনভর ব্যাখ্যা করেন এবং এই অহিংসার পথাশ্রয়ী হয়ে ভারতকে চালিত করে স্বাধীনতা আনেন।

রবীন্দ্রনাথ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের মধ্য দিয়ে এই অহিংসার কথা প্রচার করলেন। নাটকের হীরো বা নায়ক রাজা প্রতাপাদিত্য নন—আসল নায়ক ধনঞ্জয় বৈরাগী। সেই বৈরাগী রাজদ্রোহী, রাজ-অত্যাচার সে সইবে না—প্রতিরোধ করবে—কিন্তু হিংসাত্মক পথ ধরবে না। প্রজার মনে জাগিয়ে তোলে সাহস, মানুষের জন্মগত অধিকার দাবী করবার মতো মনের বল। সে গান ধরে—

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোরা রাজার সনে মিলবো কী সত্বে।....
রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কী সত্বে।

বৈরাগী মার খায়, কিন্তু মারে না; তার প্রাণে অগাধ বিশ্বাস, মনে অসীম সাহস। মার খেয়েও সে গান ধরে—

বল ভাই ধন্য হরি। বাঁচান, বাঁচি, মারেন মরি।

মার খায়, আবার গায়—

"আরো আরো প্রভু, আরো আরো
এমনি ক'রে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি, আমি পালিয়ে বেড়াই—
ধরা পড়ে গেছি, আর কি এড়াই।
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো॥
এবার যা করবার তা সারো সারো
আমি হারি কিংবা তুমিই হারো॥

রাজনীতিক নেতার নূতন আদর্শ মানুষ সৃষ্টি করলেন এই ধনঞ্জয় বৈরাগী—এ যেন 'নাঙ্গা ফকীরে'র অগ্রদূত কবির মানসনেত্রে প্রকাশ পেয়েছে। 'প্রায়শ্চিত্তে'র মধ্যে যে ভক্তিপ্লুত গানের ধারা নেমেছে, তা এখন থেকে চললো গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালির মধ্য দিয়ে,—আর তার পথের ধারে জাগলো শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন নাটকগুলি। 'ডাকঘর' ছাড়া আর সব কয়টিই গীত সুধারসে পূর্ণ।

এতকাল শান্তিনিকেতন মন্দিরে ও কলকাতার মাঘোৎসবের উপাসনায় কবি ধর্মবিষয়ক ভাষণ দিয়েছেন,—অজস্র ব্রহ্মসংগীত লিখে আসছেন বিশ বৎসর বয়স থেকে। কিন্তু এখন থেকে যে গান লিখছেন তা যেন আসছে অন্ত-অনুভূতির স্তর থেকে। আর প্রতিদিন প্রাতে অন্ধকার থাকতে শান্তিনিকেতন মন্দিরে গিয়ে ধ্যানলব্ধ যে যে কথাগুলি প্রায় স্বগতোক্তির মতো সহজভাবে নির্গত হয়—সেগুলি 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালা নামে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি যেন ব্রাহ্মধর্মের বা উপনিষদের ভাষ্য—কবির শোকাহত চিত্তের গভীর আত্মানুভূতি হইতে উৎসারিত। গভীর অনুভূতির সংস্পর্শে সমাজ ও সংসার সম্বন্ধে বহু জীর্ণ মত পরিত্যক্ত হলো ; সমাজ সংস্কারের শৌখীন সাম্যবাদ এ নয়, এ জীবনের স্পর্শ প্রণোদিত গভীর আত্মকথা।

তিন বৎসর পরে রথীন্দ্রনাথ আমেরিকা থেকে ফিরলেন। কবির মন বেশ প্রসন্ন, ভাবছেন পুত্রের বিবাহের কথা। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের পথে প্রলয়ঙ্কর কাজ করলেন পুত্রের বিধবা-বিবাহ দিয়ে—এ পর্যন্ত এটি ঘটেনি এ সংসারে।

সাহিত্যে বিচিত্র রচনা চলছে এ কয় বৎসর—'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের পর, শারদোৎসব, রাজা, অচলায়তন, ডাকঘর, গীতাঞ্জলির গান, শান্তিনিকেতনের ধর্মদেশনা। 'গোরা' প্রায় তিন বৎসর প্রবাসীতে ধারাবাহিক বের হয়ে শেষ হয়েছে। 'গোরা' এক সমস্যামূলক উপন্যাস।

কবির পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হলে, বেশ ঘটা করে শান্তিকেতনে উৎসব হলো (১৯১১ মে)। এ বৎসর থেকে জন্মোৎসব পালনের সূত্রপাত। আজ এই দিনটি বাঙালি জাতীয় উৎসব-দিন ব'লে গ্রহণ করেছে।

বর্ষাকাল, শিলাইদহে আছেন—সেখানে লিখলেন 'অচলায়তন' নাটকটি। সমাজের ও ধর্মের অচলতা ভাঙতে হবে।

"আমাদের দেশে সাধনা-মার্জিত চিত্তশক্তি যতই মলিন হয়েছে, এই নিরর্থক বাহ্যিকতা ততই বেড়ে উঠেছে—একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আমাদের এই দুর্গতির দিনের জড়ত্বকেই আমি কোনো মতেই ভারতবর্ষের চিরন্তন অভিপ্রায় ব'লে গ্রহণ করতে পারিনে।"

সম্পূর্ণ বিভিন্ন অভিঘাতে রচিত হয় 'রাজা' ও 'ডাকঘর'। দুইটিতেই রাহস্যিক পরিবেশ। প্রায়শ্চিত্তে রাজা অত্যন্ত বাস্তবভাবে প্রকট, শারদোৎসবে বাস্তব রাজা ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন, 'রাজা'র রাজা অদৃশ্য, 'ডাকঘরে'রও তদ্রূপ। এই দুটি নাটকের কোনো জাত নেই, অর্থাৎ যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালের লোকের মনে এই আধ্যাত্মিক সংগ্রাম দেখা দিতে পারে। তাই কবির এই দুটি নাটিকা বিদেশে নানা ভাষাভাষীর মধ্যে অভিনীত হয়ে আসছে।

১৯১১ সালের শেষে রবীন্দ্রনাথ ভারত-সংগীত 'জনগণ-মন-

অধিনায়ক' গানটি লেখেন, ডিসেম্বর মাসে কলকাতা কংগ্রেসে প্রথম ও কয়েকদিন পরে মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীত রূপে গাওয়া হয়। রচনার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে কংগ্রেস এই গানটিকে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণ করেন। রচনাকালে কে জানতো যে ভারতের বিচিত্রকে বাঁধবার মন্ত্র এই গানের মধ্যে রয়েছে।

১৯১২ সালে ২৮ জানুয়ারী দিনটি আজ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ঐ দিনে বাঙালির প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কবির পঞ্চাশ বৎসরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে টৌনহলে নিষ্পন্ন করলেন।

পরিষদের পক্ষ হতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অভিনন্দন পড়লেন।

"কবিবর, পঞ্চাশবর্ষ পূর্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্ক শোভা বর্ধণ করিয়া বাংলার মাটি ও বাংলার জলের সহিত নূতন করিয়া পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল।....

"পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযুষে বর্ধন করিয়াছেন, সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুর কামনা করিতেছেন। কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।"

শতাব্দী শেষে আজ পৃথিবীব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে।

চতুর্থ স্তবক

(১৯১২—১৯১৮)

সুদূরের পিয়াসী কবি-চিত্ত নৃত্য করে ওঠে যখনি দেশভ্রমণের কথা কানে যায়। রথীন্দ্রনাথরা কোথায় যাবেন—কথা উঠেছে। কবির মন মেতে উঠলো। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো সকলে মিলে বিলাত যাবেন। কবির সঙ্গী ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র লিখছেন—

"ভোরে কলকাতা থেকে জাহাজ ছাড়বে। ....কবির বাক্স-প্যাঁটরা ক্যাবিনে উঠল। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু কবি কই ? বহুলোক উপস্থিত, তাঁদের মুখ বিষণ্ণ হল। খবর এল যে, কবি অসুস্থ—আসতে পারবেন না।"

কবি অসুস্থ শরীরে চলে গেলেন শিলাইদহে বিশ্রামের জন্য। বিদেশে যাবার আশা ত্যাগ করলেন না। ভাবছেন যদি বিদেশে যেতেই হয়—সেখানে হয়তো বন্ধু-বান্ধবরা জানতে চাইবে তাঁর সাহিত্যের কথা। আপন মনে গান লেখেন ও অবসর সময়ে 'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য কাব্য থেকে মনের মতো কবিতা ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করেন।

বিলাত কেন যাচ্ছেন—এ কথাও আজ প্রশ্ন জাগছে। আঠারো বৎসর বয়সে ব্যারিস্টার হবার দুরাশা নিয়ে সে দেশে প্রথম যান। তারপর দ্বিতীয়বার যান যৌবনে—নিতান্ত খেয়াল বশে—অকারণে চঞ্চলহৃদয়ে। পঞ্চাশোর্ধে চলেছেন বিদেশে—মন কৈফিয়ত খুঁজছে। বলছেন, এ তাঁর তীর্থযাত্রা। "য়ুরোপ গিয়ে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব—এই শ্রদ্ধাটি লইয়া যদি আমরা সেইখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে, এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলবে !"

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী
তীরে ব'সে যায় যে বেলা, মরি গো মরি।....
....শূন্য মনে কোথায় তাকাস।
সকল বাতাস, সকল আকাশ
ও পারের ওই বাঁশির সুরে উঠে শিহরি॥

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর।
ভোরের আকাশ রাঙা হল রে,
আমার পথ হল সুন্দর।
কী নিয়ে বা যাব সেথা ওগো তোরা ভাবিসনে তা,
শূন্য হাতেই চলব বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর॥

রবীন্দ্রনাথ পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে বিলাত পৌঁছলেন। বৃটিশ-শিল্পী রোদেনস্টাইনের সঙ্গে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করতে গেলেন। গত বৎসর রোদেনস্টাইন যখন কলকাতায় যান, তখন গগনেন্দ্রনাথদের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেখেন, তাঁর ছবিও একটা আঁকেন।

কবি লিখছেন, "ভারতবর্ষে এঁর সঙ্গে আমার ক্ষণকালের জন্য আলাপ হয়েছিল। এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হোতে পারব—এই লোকটি য়ুরোপে যাত্রার সময় আমার মনকে টেনেছিল।"........

"অপরিচয় হতে পরিচয়ের পথ অতি দীর্ঘ। সেই দুঃসাধ্যপথ অতিক্রম করবার সময় আমার ছিল না।....এমন সময়ে প্রবেশ করলেন বন্ধু, পর্দা তুলে দিলেন, দেখলুম আসন পাতা, দেখলুম আলো জ্বলছে, বিদেশীর অপরিচয়ের মস্ত বোঝাটা বাইরে রেখে....নিভৃতে এসে প্রবেশ করলুম।"

এবার রোদেনস্টাইনের কথা—

"মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গল্পের

(ভগিনী নিবেদিতা কৃত কাবুলিওয়ালা) অনুবাদ পড়ে আমি এতই মুগ্ধ হই যে, আমি তখনই জোড়াসাঁকোয় (গগনেন্দ্রনাথদের) পত্র লিখে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্প আর কোথায় পাওয়া যাবে জানতে চাই। কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি কবিতার একটা খাতা আমার নিকট এল। কবিতাগুলি উচ্চ-অধ্যাত্ম ভাবপূর্ণ বা মিস্টিক এবং আমার মনে হল গল্পের অপেক্ষা এগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কবিতাগুলি পড়ে যেমন মুগ্ধ হলাম, তেমনি বিস্মিত হলাম। এই সময়ে (নববিধান সমাজের) প্রমথলাল সেনের সহিত আমার পরিচয় হ'ল। তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়কে আমার বাড়িতে আনলেন। রবীন্দ্রনাথকে লণ্ডনে আনবার জন্য আমি তাঁদের পত্র লিখতে অনুরোধ করি। তারপরই একদিন শুনলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লণ্ডনে আসছেন। তখন থেকে প্রতি মুহূর্তে আমার গৃহে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

"রবীন্দ্রনাথ যে-সব বাংলা কবিতা নিজেই তর্জমা করেছিলেন সেই খাতাটি আমায় উপহার দিলেন।....কিন্তু আমি এই মুক্তারাশির কী মর্ম বুঝব....সেইজন্য কবিশ্রেষ্ঠ ইয়েটসকে এই রত্নের সন্ধান দিলাম।.... কবি ·ইয়েটস কবিতাগুলি পাঠ করে এমন মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর পল্লীবাস থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্য লণ্ডনে ছুটে এলেন।"

গীতাঞ্জলির ইংরেজি তর্জমার টাইপ্-কপি ঘুরলো সাহিত্যিকদের মধ্যে। সকলেই মুগ্ধ। একদিন লণ্ডনের এক হোটেলে বহু ইংরেজ সাহিত্যিক জমায়েত হলেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনবার জন্য, ইয়েটস সভাপতি। তিনি বলেন—

"একজন শিল্পীর জীবনে সেইদিন সকলের চেয়ে বড় ঘটনার দিন, যে দিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন, যাহার অস্তিত্ব তিনি পূর্বে অবগত ছিলেন না। আমার কাব্য জীবনে আজ এই একটি মহৎ ঘটনা উপস্থিত হয়েছে যে, আজ আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংবর্ধনা ও সম্মান করবার ভার পেয়েছি।....আমার সমসাময়িক এমন

কোন ব্যক্তিকে আমি জানি না, যিনি এমন কোনো রচনা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছেন যার তুলনা হতে পারে এই কবিতাগুলির সঙ্গে।”

ইয়েটস এই কবিতাগুচ্ছের ভূমিকা লিখলেন—বই ছাপালেন ইণ্ডিয়া সোসাইটি—মাত্র সাড়ে সাতশ' কপি। তারপর বৃটিশ সাহিত্যিক ও বৃটিশ পত্রিকার সমালোচনা পড়ে ম্যাকমিলন কোম্পানি প্রকাশনার ভার গ্রহণ করলেন। এ খবর কবি যখন পেলেন, তখন তিনি মার্কিন মুলুকে। ইংলণ্ডে বাসকালে কত কবি, সাহিত্যিক মনীষীর সঙ্গে দেখা হলো ; আর কয়েকটা বিদ্যালয়ও ভালো ক'রে দেখে নিলেন।

মাস চার ইংলণ্ডে থেকে কবি সপরিবারে চললেন আমেরিকা (১৯১২ নভেম্বর)। নূতন পৃথিবীতে কবির এই প্রথম পদার্পণ, নিউ-ইয়র্ক থেকে সোজা চলে গেলেন ইলিনয় স্টেটের আর্বানা শহরে—সেখানে রথীন্দ্রনাথরা ছাত্ররূপে তিন বছর কাটান—সেখানকার অধ্যাপকদের সঙ্গে পত্রযোগে কবির পরিচয় ছিল।

আর্বানা ছোট শহর—“কোথা কোনো গোলমাল নেই—আকাশ খোলা, আলো পর্যাপ্ত, অবকাশ অব্যাহত—মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যাই যে আমেরিকায় এসেছি—ঠিক মনে হয় যেন দেশে আছি।”

মার্কিন মুলুকের এই মফঃস্বলী শহরে ইউনিটেরিয়ান পাদরী ভেইলের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের ভজনালয়ে ধর্মবিষয়ে পাঁচটি প্রবন্ধ পাঠ করেন—ইংরেজিতে ভাষণ দানের এই হলো কবির প্রথম প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথের নিউইয়র্কের অন্তঃপাতী রচেস্টার শহরে উদার ধর্মমনাদের সম্মেলনে আহ্বাহন এলো—য়ুরোপ থেকেও বহু পণ্ডিত এসেছেন। কবির ভাষণের বিষয় রেস্ কনফ্লিক্ট (Race Conflict) বা জাতি-সংঘাত।

“মানব ইতিহাসে জাতি-সংঘাতের সমস্যা চিরকালই রয়েছে, সকল বড় সভ্যতার মূলে এই সংঘাত লক্ষ্য গোচর হয়। এইরূপ

জাতিগত বৈষম্যগুলিকে যখন গণ্য করতেই হয় এবং এদের পাশ কাটিয়ে চলবার কোনো উপায় নেই, তখন বাধ্য হয়ে মানুষকে একটা একসূত্রকে খুঁজে বের করতেই হয়—যা সকল বিচিত্রকে এক করে গাঁথতে পারবে।”

আমেরিকার এক বিশিষ্ট পত্রিকা বললেন সভামঞ্চে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ ব্যক্তি কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

এবার কবি বিদেশে এসে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-পদ্ধতি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছেন। মনে হচ্ছে তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়কেও বড়ো করে তুলতে হবে। লণ্ডন থাকতে কবি হঠাৎ সুরুলের জঙ্গলভরা কুঠি-বাড়িটা কিনে ফেলেন রায়পুরের কর্নেল এন. পি. সিংহের কাছ থেকে। কবির ইচ্ছা সেখানে বিজ্ঞানাগার সংস্থাপন করে গবেষণার কাজ চলবে।

“আমার ইচ্ছা ওখানে দুই একজন যোগ্য লোক এক একটি ল্যাবরেটরী নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন, তাহলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে।.... আমার অনেকদিনের সংকল্প জ্ঞান-অনুশীলনের একটা হাওয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে ছাত্রদের মন আপনিই অলক্ষিতভাবে বিকাশ লাভ করতে পারবে।” জ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন হয়। কবির ১৯১২ সালের বিশ্বভাবনা রূপ নিল প্রায় দশ বৎসর পরে বিশ্বভারতী নামে।

আমেরিকা থেকে লণ্ডনে আসার পর কবি দেখেন গীতাঞ্জলির কী প্রচারটা হয়েছে, কাগজে পত্রে তাঁর নাম আর ছবি! পত্র পান অজানা নর-নারীর কাছ থেকে,—কী সান্ত্বনা বহন করে এনেছে ‘গীতাঞ্জলি’ ; সেই কথা কৃতজ্ঞচিত্তে জানাচ্ছে।

“চারিদিকে আমার নিজের নামের এই-যে ঢেউ তোলা এ আমার কিছুতেই ভালো লাগছে না। এই নিয়ে আমার নিজের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে।”

কবির বহুদিনকার ইচ্ছা ভারতের ধর্ম ও দর্শনের বড় দিকটার কথা পশ্চিমের কাছে বলবার। এবার সে সুযোগ হলো লণ্ডনে, ক্যাকস্টন হলে ছয়টা ভাষণ দিলেন। সেগুলো 'সাধনা' (Sadhana) নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে। আসলে এগুলি 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন' উপদেশমালার মূল কথার ভাবব্যাখ্যান—কয়েকটি প্রায় অনুবাদ।

ব্যক্তিগত ঘটনা। অনেক বৎসর ধরে কবি অর্শরোগে ভুগছিলেন—অসহ্য যন্ত্রণা নীরবে ভুগতে দেখেছি। এবার অস্ত্রোপচার করে সেই ব্যাধিমুক্ত হলেন। আরোগ্যলাভ করে লণ্ডনে আছেন—কাব্যলক্ষ্মী দেখা দিলেন সুরের রূপে। গীতিমাল্যের কতকগুলি সুপরিচিত গান লিখলেন—

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে
পরতে গেলে লাগে এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।
*　　　　*　　　　*
ওই দিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে॥
তোমার কাছে দেখাই নে মুখ মণিমালার লাজে॥

লণ্ডনে বসেই লেখা গান—

তোমারই নাম বলবো নানা ছলে
বলব একা বসে আপন মনের ছায়াতলে।
বলব বিনা ভাষায়, বলব বিনা আশায়,
বলব সুখের হাসি দিয়ে, বলব চোখের জলে।

ষোল মাস পরে কবি দেশে ফিরলেন। পথেও গান রচনা চলছে এবং দেশে এসেও তার রেশ চলে বহু দিন। শান্তিনিকেতনে পৌঁছে কয়েকদিন পরে তাঁর বিলাতের নূতন বন্ধু পাদরী এনড্রুজকে দিল্লীতে লিখছেন—"Just now the singing mood is upon me, and I am turning fresh songs every day"

"বোলপুরে আমার আসনটি এমন জমে গেছে যে এখান থেকে নড়তে আমার সাহস হয় না। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখের দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি —সেইজন্য এইখানেই পড়ে থাকি এবং পড়ে থেকেই আমার ভ্রমণের কাজ হয়।"

দূরপিয়াসী ও নীড়বিলাসী মন একসূত্রে গাঁথা—'তদ্ এজতি, তদ্ ন এজতি'। সে চলেছে বটে, সে চলেও না বটে।

দেশে ফেরবার মাস দেড় পরে একদিন সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম এলো বোলপুরে—সুইডেন থেকে কবিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। খুব শিক্ষিত লোক ছাড়া নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকের কোনো ধারণাই ছিল না; তারা দেখছে এই পুরস্কারের মূল্য এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা। কিন্তু অর্থ থেকে অনেক বড় কথা হচ্ছে যে, একজন বাঙালি সেটি লাভ করলেন। তখন পর্যন্ত কোনো এশিয়ান এ সম্মান পাননি এবং এখন পর্যন্ত কোনো এশিয়ান কবি এর অধিকারী হন নি।

খবরটি পেয়ে বিলেতে বন্ধু রোদেনস্টাইনকে লিখলেন—[অনুবাদ]

"যে মুহূর্তে নোবেল পুরস্কার দানের সংবাদ পেলাম, তদ্দণ্ডেই আমার অন্তর আপনার প্রতি ভালোবাসায় ও কৃতজ্ঞতায় স্বতঃই ধাবিত হয়েছিল।....পাবলিক উত্তেজনার রীতিমত যে ঘূর্ণিবায়ু উঠেছে, তা বিভীষিকাময়। একটা কুকুরের লেজে টিন বেঁধে দিলে বেচারা নড়লেই যেমন শব্দ হয় এবং চারিদিকে লোকের ভিড় জমে—আমার দশাও সেই রকমের। গত কয়েকদিনের টেলিগ্রাম ও চিঠির চাপে আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।"

গীতাঞ্জলি ছাড়া পাঁচমিশালি কবিতা নিয়ে 'গার্ডনার' 'রাজা' ও 'ডাকঘরে'র তর্জমা, সাধারণ প্রবন্ধাবলী ইংলণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজি থেকে য়ুরোপের প্রথায় সকল ভাষাতেই তার অনুবাদ বের

হচ্ছে—তাই রবীন্দ্রনাথের নাম আর শুধু ইংরেজিভাষী জগতে সীমিত নেই—সকল দেশেই তিনি সুপরিচিত।

এবার বিলাতে থাকার সময় দিল্লী সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক পাদরী এন্ড্রুজের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। কবির আদর্শবাদ এন্ড্রুজ ও তাঁর বন্ধু পিয়ার্সনকে এমনই মুগ্ধ করে যে, তাঁরা শান্তিনিকেতনে এসে কবির কাজে আত্মনিয়োগের সংকল্প গ্রহণ করলেন।

তাই সেবার সাতই পৌষের উৎসবে মন্দিরে বললেন, "এ আশ্রম —এখানে কোনো দল নেই।····আমাদের আশ্রম থেকে কেউ নাম নিয়ে যাবে না। এখানে আমরা যে ধর্মের দীক্ষা পাব, সে দীক্ষা মানুষের সমস্ত মনুষ্যত্বের দীক্ষা।

"যে কোনো ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করে যিনিই এখানে আশ্রয় চাইবেন, আমরা যেন কাউকে গ্রহণ করতে কোনো সংস্কারের বাধা বোধ না করি। কোনো সংস্কারের লিপিবদ্ধ বিশ্বাসের দ্বারা আমাদের মন যেন সংকুচিত না হয়।"

কবির ধর্মজীবনে ও কর্মজীবনে নূতন পরিচ্ছেদ শুরু হলো।

য়ুরোমেরিকা সফরের পর মাস পাঁচ ছয় কেটে গেছে। গান ছাড়া অন্য লেখা খুব কম। এমন সময়ে 'সবুজ পত্র' নামে নূতন মাসিক প্রকাশের যেমন ব্যবস্থা করলেন প্রমথ চৌধুরী—অমনি কবির লেখনীতে কোথা থেকে যেন জোয়ার এল—নূতনের আহ্বানে সমস্ত সত্ত্বা সাড়া দিয়ে উঠল। গদ্য পদ্য গল্প উপন্যাস লিখে চললেন।

বিদেশ থেকে এসেছেন—মনের মধ্যে অনেক কথা জমেছে। কিন্তু দেশের দিকে তাকিয়ে দেখেন সব যেন প্রাণহীন নিঃসাড়। "সমাজে যে চলার ঝোঁক আসিয়াছিল সেটা কাটিয়া গিয়া বাঁধিবোলের বেঁড়া বাঁধিবার দিন আসিয়াছে। চলিতে গেলেই—বাধা। অতএব—

খাঁচার সীমাটুকুর মধ্যে যতটুকু পাখা ঝাপট সম্ভব সেইটুকুই বিধি, তাহাই ধর্ম, তার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা নিষেধ।"

তাই 'সবুজের অভিযান' কবিতায় বললেন—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা।....
ঘুচিয়ে দে তুই পুঁথি পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি বিধান খাঁচা
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।"

এমন করে 'নবীন প্রাণের চর'দের কেউ আহ্বান করেনি—যৌবনকে কেউ সম্মান দেয়নি। এই কবিতা (১৩২১ বৈশাখঃ ১৯১৪ মে) থেকে কবির নূতন কবিতার জন্ম—বলাকা পর্বের সূত্রপাত।

'সবুজ পত্রে'র চাহিদায় ছোট গল্প লেখা শুরু করলেন বহুকাল পরে। সাধনাযুগের পর কয়েকটা গল্প খুচরাভাবে সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছে—কালের বহু ব্যবধানে, কিন্তু এবার গল্পের জোয়ার এল, আর তার রূপও গেল বদলে। পাশ্চাত্যশিক্ষার অভিঘাতে নারীর ব্যক্তিত্বও জাগছে—এই তত্ত্বটি 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে সর্বপ্রথম পাই। এই ছোট গল্পটিকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে বেশ একটু কোলাহল জমে ওঠে—যেমন জমেছিল য়ুরোপে ইব্‌সনের 'ডল্‌স্ হাউস' বের হবার পর। বাংলা সাহিত্যে নারী বিদ্রোহের প্রথম পতাকা তুললো 'সবুজ পত্র'।

তারপর চারটে ছোট গল্প মিলে 'চতুরঙ্গ' নামে যে গল্পোপন্যাস দেখা গেল, তাতেও নারীর সমস্যা তীব্র রূপ নিয়েছে—শচীশকে ভালবেসে দামিনী বিবাহ করলো শ্রীবিলাসকে সমাজের মুখরক্ষা করবার জন্য।

এর থেকে নারীর দাম্পত্য জীবনের সমস্যা নিয়ে 'ঘরে বাইরে'

উপন্যাস যখন বের হতে থাকল—তখন লোক বুঝলো কাল বদলের পালা এসেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস নিয়ে কবিকে বেশ দু'চার কথা সম্পাদকদের কাছ থেকে শুনতে হয়।

কিন্তু "যৌবন জলতরঙ্গ কে রোধিবে রে?"

গ্রীষ্মকালে কবি সপরিবারে গেছেন রামগড় পাহাড়ে—নৈনীতালের কাছে। সেখানে বলাকার কবিতা লিখছেন—কিন্তু মনে কিসের আশঙ্কা? কি যেন দুর্দৈব আসছে!

হঠাৎ ১৯১৪ সালের অগস্ট মাসে য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল—সার্বিয়ার এক শহরে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। দেখতে দেখতে যুদ্ধ য়ুরোপময় ছড়িয়ে পড়লো। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রার্থনা করলেন—"স্বার্থের বন্ধনে জর্জর হয়ে রিপুর আঘাতে আহত হয়ে....মরছে মানুষ—বাঁচাও তাকে। বিশ্বের পাপের যে মূর্তি আজ রক্তবর্ণে দেখা দিয়েছে, সেই বিশ্বপাপকে দূর করো।" কবির প্রশ্ন কেন এই পাপের বেদনা! মানুষের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নাই—সমস্ত মানুষ এক। সেইজন্য মানুষের সমাজে একজনের পাপের ফল ভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে দূরে দূরান্তরে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরস্পরে বাঁধা হয়ে আছে।....সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে।"

কবির মন নানা কারণে উদ্‌ভ্রান্ত—শান্তিনিকেতনে স্থির হয়ে থাকতে পারছেন না। এলাহাবাদে উঠেছেন ধনী আত্মীয়ের বাড়ি—হঠাৎ চোখে পড়লো দেয়ালে-টাঙানো প্রায় ভুলে-যাওয়া বউঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবীর ঝাপসা ফোটো। লিখলেন—

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।
চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।....

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।....
একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি।
তারপরে আমি
কত দুঃখ সুখে
রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।....
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে।
তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।....
ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজ তাই....
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

আর লিখলেন শাহজাহান কবিতা—
স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

উত্তর ভারতে ঘুরছেন, কখনো আসছেন কলকাতায়, কখনো জমিদারিতে।

কবি খবর পেলেন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজি গেছেন বিলাতে। তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের রওনা করে দিয়েছেন ভারতে। এন্ড্রুজের ব্যবস্থায় তারা আশ্রমে আশ্রয় পেয়েছে। ঘটনাটা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়—কারণ এর থেকে ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষীর

জানাশোনার সূত্রপাত—রবীন্দ্রনাথ হলেন তাঁর কাছে গুরুদেব, গান্ধীজি হলেন মহাত্মাজি।

কবি আছেন শ্রীনিকেতনে—লিখছেন 'ফাল্গুনী' নাটক ও তার জন্য গান। গান্ধীজি এলেন শান্তিনিকেতনে—দুইজনের সাক্ষাৎ হলো ১৯১৫ সালের ৬ মার্চ।

কলকাতায় জোড়াসাঁকোর লালকুঠি এখন যেখানে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের দপ্তর ছিল—সেই বাড়িতে 'বিচিত্রা' ক্লাব হয়েছে। নিচের ঘরে লাইব্রেরী—উপরতলে মজলিশ সভা, অভিনয়। রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই উপস্থিত থাকেন—কলকাতার তরুণ সাহিত্যিকরা সন্ধ্যায় এসে জোটেন সেখানে।

স্থির হলো বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের জন্য 'ফাল্গুনী' নাটক অভিনয় করে টাকা তুলতে হবে। যশমণ্ডিত হবার পর রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ে নামলেন এই প্রথম। নাটকের গোড়ায় একটা প্রযোজক নাটিকায় কবি শেখরের ও মূল ফাল্গুনী নাটকে অন্ধ বাউলের ভূমিকায় নামলেন। একবার দেখা গেল দৃপ্ততেজ চঞ্চলচরণ কবি শেখরকে—আরেকবার দেখা গেল অতিবৃদ্ধ অন্ধ বাউলকে—গান গাইছেন—

ধীরে বন্ধু ধীরে—
চলো তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই যে আলো, ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণ শব্দ বরণ করেছি
আজ এই অরণ্য গভীরে।

দুটো মানুষ বাসা বেঁধে আছে কবির চিত্তে—একজন নীড়বিলাসী—ঘরে থাকতে চায়; অন্যজন সুদূরের পিয়াসী—ঘর ছাড়তে চায়। কাউকে কোথাও যেতে দেখলেই মনে হয় তিনিও চলেন তার সঙ্গে—ডাকঘরের অমলের মানস ভ্রমণ। এবার চললেন কাশ্মীর। শ্রীনগরের

ঝিলাম নদীর ওপর নৌকায় আছেন। ভূস্বর্গ মোটেই ভালো লাগছে না।

"আসলে আমার পদ্মার বালির চরে বোটের কাছে কেউ লাগে না....। কেবল ওখানে বিষয়-কর্মের যে গন্ধ আছে সেইটেতে আমাকে নাড়া দেয়—নইলে সেই জলের ধারে চুপচাপ করে পড়ে থাকতুম"।

শ্রীনগরে লিখলেন—

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ; ....
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে,
মনে হল, সৃষ্টি যেন স্বপ্ন চায় কথা কহিবারে....
হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।
এই বাসা-ছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

কবির মন অন্য কোনখানের জন্য অকারণে চঞ্চল। কাশ্মীর থেকে ফিরে কন্যাকে লিখছেন, 'কোথাও যাব যাব করছিলুম। গতবার বিলেত যাবার আগে যেমন একটা ছটফটানিতে আমাকে পেয়েছিল, এবারেও কতকটা সেই রকম চঞ্চলতা আমাকে দোলাচ্ছিল। কিন্তু যুদ্ধের উপদ্রবে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ....।'

যাওয়ার পথ পেলেন অকস্মাৎ—য়ুরোপে নয়—আমেরিকায়। আমেরিকার লোকে বক্তৃতা শুনতে চায় পয়সা দিয়ে—সে সবের ব্যবস্থা করবার কোম্পানী আছে। সেই রকম কোম্পানীর কাছ

থেকে নিমন্ত্রণ এলো। কবির যাবতীয় ব্যয়ভার কোম্পানীর, আর শহরে শহরে বক্তৃতা করবার ভার কবির! তার জন্য তারা বারো হাজার ডলার দেবে। ভ্রমণের নেশায় আগ-পিছু না বিবেচনা করে এই কোম্পানীর প্রস্তাবে রাজী হলেন—

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা—সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

চললেন আমেরিকা—জাপানের পথে—সঙ্গে আছেন পিয়ার্সন এনড্রুজ ও তরুণ শিল্পী মুকুল দে। কবির জন্মদিন (১৯১৬, ৭ মে) কাটলো রেঙ্গুনের কাছে—সেদিন কবি তাঁর 'বলাকা' কাব্যখানি উৎসর্গ করলেন পিয়ার্সনকে।

রেঙ্গুন, পিনাঙ, সিঙাপুর, হঙকঙ বন্দরে নেমে ও থেমে অল্প সময়ের মধ্যে যা দেখবার তা দেখে নিয়ে অবশেষে পৌঁছলেন জাপানে। জাপান সম্বন্ধে কবির এই প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়। কিন্তু বিংশ শতকের গোড়ায় জাপানী মনীষী শিল্পশাস্ত্রী ওকাকুরার সংস্পর্শে এসে প্রাচ্য এশিয়াকে জানবার ঔৎসুক্য জাগে। তারপর বহু জাপানী চিত্রশিল্পী

আসেন অবনীন্দ্রনাথদের কাছে। শিল্পীদের মধ্যে ভাবের বিনিময় ও রূপকল্পনার আদান-প্রদান চলে, ভারত শিল্পের উপর তাদের টেকনিকের স্পর্শ রেখে গেছে। সেই শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন তরুণ তাইক্কান—এখন জাপানের অন্যতম প্রতিষ্ঠিত চিত্রকর। রবীন্দ্রনাথ টোকিওতে এই তাইক্কানের বাড়িতে উঠলেন।

বক্তৃতার আহ্বান এল নানা প্রতিষ্ঠান থেকে। কবি যে সব ভাষণ দিলেন তার মধ্যে জাপানের উদ্ধত সাম্রাজ্য-লোলুপতার কড়া সমালোচনা ছিল; তখন মহাযুদ্ধ চলছে। জাপান বৃটিশের মিত্র হয়ে চার বৎসরের গড়া চীন রিপাবলিকের উপর জুলুম করছে। কবির কাছে চীনও শ্রদ্ধেয়।

বলা বাহুল্য, 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'—বিশেষ যখন সফলতার বিজয় কেতন উড়ছে তার চারিধারে। জাপানী সরকার রবীন্দ্রনাথের উপর মনে মনে বিরক্ত হলেন ও তারপর এমন কলকাঠি টিপলেন যে কবির বক্তৃতা দেওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

কবি আছেন হাকান নামে পল্লীতে। "আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারাসান্ গুণী এবং গুণজ্ঞ, তিনি রসে, হাস্যে ঔদার্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের গায়ে তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্বসাধারণের জন্য উদ্ঘাটিত········বাগানটি নন্দন-কাননের মতো।···· রাজার মতো যত্ন পাচ্ছি। এমন সুন্দর জায়গা আর কোথাও পাব বলে মনে হয় না।"

জাপানে তিনমাস কাটলো—বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা লিখে যাচ্ছেন পত্রধারায়।

আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের তীরস্থ বন্দর সিয়াটলে পৌঁছলে কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন মেজর পন্ড। ইনিই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন। কবি তাঁকে বললেন, "তুমি আমার সম্পূর্ণ ভার নাও, তুমি

যতো বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারবে, আমি দেবো। আমার নিজের কোনো প্ল্যান নেই। যতই বক্তৃতা হবে, ততই আমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা হবে।”

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই টাকাটা যায় তারক পালিতের ঋণ শোধ করতে—কুষ্টিয়ার ব্যবসা গোটাবার সময়ের এই ধার—এতদিনে তার থেকে মুক্তি পেলেন

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর থেকে আটলান্তিক তীর পর্যন্ত শহরে শহরে চললো বক্তৃতা পর বক্তৃতা; পৌঁছলেন শিকাগো।

এই পর্যন্ত এসেছিলেন ১৯১২ সালে—নিউইয়র্কের পথে পূবদিক থেকে। দুইমাস প্রায় প্রতিদিন একই বক্তৃতার পুনরুক্তি করতে করতে অবশেষে নিউইয়র্কে যখন এলেন, তখন শরীর মন দুই-ই ক্লান্ত হয়ে উঠেছে—আর ভালো লাগছে না। বোস্টন, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি কয়েকটা স্থানে ভাষণ দিয়ে কবি পন্ডের চুক্তিপত্র বাতিল করে দিলেন। তারজন্য মোটা টাকার খেসারত দিতে হলো চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে।

ফিরতি পথে ক্লেভল্যাণ্ড শহরে শেক্সপীয়র গার্ডেন নামে বিশাল পার্কে নাগরিকদের অনুরোধে কবিকে একটি বৃক্ষরোপণ করতে হলো। এই বোধ হয় কবি জীবনের প্রথম বৃক্ষরোপণ উৎসব। শুনেছি সেই গাছটি এখনো আছে।

কবির এই সফর ও বক্তৃতাবলী নানা কারণে স্মরণীয়। জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমের উর্ধ্বে যে বিশ্বমানবতা—এই কথাটি কবি নানাভাবে প্রচার করেছিলেন যুদ্ধোন্মত্ত সভ্য মানুষের কাছে ‘ন্যাশনালিজম্’ বক্তৃতামালায়। মানুষের বৃহত্তর সত্তার সাধন কথা বললেন ‘পার্সোনালিটি’র ভাষণগুলির মধ্যে। বিশ্বমানবতা সেদিন দেশে বিদেশে বিদ্রূপের বিষয়। উগ্র স্বাজাত্যবোধের তীব্র বিষজ্বালায় জর্জরিত মানুষ সমস্ত মহৎ আদর্শকে বিকৃত করছিল

নির্লজ্জভাবে। কিন্তু একদিন এই বিশ্বমানবতা ও বিশ্বজাতিকতাকেই সভ্যমানুষকে চরম বলে মানতে হয়েছিল।

দেশে ফিরে আসার পর কবির সম্বর্ধনা সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছিলেন—"সেবারে (১৯১২-১৩) গীতাঞ্জলিতে কবি ওধারকার ব্যক্তিগত জীবনের অশান্তি নিবারণার্থে এক শান্তিমন্ত্র লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি গাহিলেন, ভগবানের সহিত আত্মার লীলাতেই সেই শান্তি। আর এবার ওধারকার সামাজিক জীবনের অশান্তি নিবারণার্থে ভারতবর্ষের চিরসাধিত শান্তি ও মৈত্রীর রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন। সেবার ব্যক্তির নিত্য সহচর ভগবানকে দেখাইলেন, আর এবার সমাজ জীবনের নিত্য সহচর The Eternal individual বা চিরন্তন ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা করিলেন।"

দেশে ফিরে দেখেন ঘরে বাইরে কোথাও শান্তি নেই। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসর চলছে—বৃটিশরা বিব্রত। ভারতে কংগ্রেস স্তিমিত হলেও বিপ্লবীরা নীরব ও নিষ্ক্রিয় নয়। ভারত সরকার অর্ডিনান্স পাশ করে বাংলা দেশ থেকে বারো শ' যুবককে আটকে ফেলেছেন—কাউকে নিজ গৃহে, কাউকে দুর্গম দুর্গে অথবা মরুভূমির মাঝে কারাগারে অন্তরীণাবদ্ধ করেছেন। মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত হোমরুল লীগ সংস্থাপন করে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয়দের আহ্বান করছেন। সেই অপরাধে তিনিও অন্তরীণাবদ্ধ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে অন্তরীণের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেন ও তারপর কলকাতায় পাবলিক মিটিং করে পড়লেন 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধ। কী উত্তেজনা—যেদিন প্রবন্ধ পড়লেন। ইংরেজের স্বৈরাচারের এমন তীব্র নিন্দা কবির লেখনী থেকে বহুকাল নিঃসৃত হয়নি। কিন্তু একথাও বললেন যে "অন্যকে অপবাদ দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা অক্ষমেরই চিত্তবিনোদন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে,

আমাদের অতীত তাহার সম্মোহন বাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে। তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্কপত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল; নব-নব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবনধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে, তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব।"

সেদিন সভায় কবির সদ্যরচিত গানটি বহুকণ্ঠে গীত হয়েছিল—

'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই।
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন-পশ্চাতে!
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে।

অ্যানি বেসান্ত মুক্তি পেলেন, কলকাতায় এলেন, দেখা হলো কবির সঙ্গে। তারপর কলকাতায় গান্ধীজি, তিলক, মালবীয় প্রভৃতি অনেকেই এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের মন গিয়েছে নাট্যের রূপদানে—'ডাকঘর' বিচিত্রায় অভিনীত হলো—কবি অংশ গ্রহণ করলেন। সেদিন এইসব নেতারা উপস্থিত হন।

কংগ্রেসে অ্যানি বেসান্ত সভানেত্রী—কবি প্রথমদিন উপস্থিত হয়ে পড়লেন India's Prayer—মূলটা নৈবেদ্যের কবিতা।

খ্যাতিলাভের পর রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম ও এই শেষ কংগ্রেসে উপস্থিতি। কলকাতায় প্রথম যে কংগ্রেস হয় (১৮৮৬) তাতে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন, 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।' তারপর ১৮৯৬ সালের কংগ্রেসে বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরমে' সুর বসিয়ে গেয়েছিলেন। তার বিশ বৎসর পরে এই প্রার্থনা পাঠ।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই কংগ্রেসের ভক্ত ; কিন্তু কখনও দলভুক্ত হননি —প্রয়োজন হলে তীব্র সমালোচনা করেও তাকে ত্যাগ করেন নি।

কলকাতার উত্তেজনা শেষে কবি শান্তিনিকেতনে এসেছেন— সাহিত্য-সৃষ্টি মন্দা ; লেখেন কথিকা বা লিপিকার গল্প। সময় যাচ্ছে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্লাস নিয়ে। বড়মেয়ে বেলা কলকাতায় মৃত্যু-শয্যায়—লিখছেন—

"জানি বেলার যাবার সময় হয়েছে। আমি গিয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারি এমন শক্তি আমার নেই। এখানে আমি জীবন-মৃত্যুর উপরে মনকে রাখতে পারি কিন্তু কলকাতায় সে আশ্রয় নেই। আমি এইখান থেকে বেলার জন্যে যাত্রাকালের কল্যাণ কামনা করছি। জানি আমার আর কিছু করবার নেই।"

গ্রীষ্মের ছুটিতে বিদ্যালয় বন্ধ হলে কলকাতায় এলেন, রোজ দুপুর বেলা বেলাকে তাদের বাসাবাড়িতে দেখতে যান। একদিন পথে গিয়ে শোনেন বেলার মৃত্যু হয়েছে। আর গেলেন না, ফিরে এলেন। সেদিন বিচিত্রা ক্লাবে গিয়ে দেখি কবি সভ্যদের মাঝে বসে কথাবার্তা বলছেন, আলোচনা করছেন—বাইরে থেকে শোকের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। 'পলাতকা' বলে যে কবিতাগুচ্ছ লিখছেন—তার একটিতে আছে—

এই কথা শুনি সদা 'গেছে চলে, গেছে চলে'।
তবু রাখি বলে
বলো না 'সে নাই'।
সে কথা মিথ্যা তাই
কিছুতেই সহে না যে
মর্মে গিয়ে বাজে।
মানুষের কাছে যাওয়া-আসা ভাগ হয়ে আছে।
তাই তার ভাষা
বহে শুধু আধখানা আশা।

পঞ্চম স্তবক

(১৯১৮-১৯২৫)

১৯১৭ সালের শেষদিকে বিলাত থেকে শিক্ষা কমিশন এসেছে—বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তদন্ত করে সুপারিশ পেশ করবেন। কমিশনের সভাপতি বিলাতের এক সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যর মাইকেল স্যাডলার; তিনি শান্তিনিকেতনে এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোলাকাত করে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মতামত জানবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ বললেন, ইংরেজির মান কিছুমাত্র না কমিয়ে as a second language শেখাতে হবে, কিন্তু ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে সমস্ত বিদ্যা স্কুল, কলেজ ও য়ুনিভারসিটিতে পরিবেশন করা চাই—the chief medium of instruction in Schools (and even in Colleges upto the stage of University degree) should be the mother tongue.

রবীন্দ্রনাথের এ মত নূতন নয়। একুশ বৎসর বয়সে লেখা এক প্রবন্ধে বলেন (১৮৮৩)—"বঙ্গ বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক।"

তারপর চৌত্রিশ বৎসর বয়সে 'শিক্ষার হেরফের' নামে শিক্ষা সমালোচনাপূর্ণ যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতেও এই কথা স্পষ্ট করেই বলেছিলেন।

অল্পকাল পূর্বে ১৯১৫ সালে 'শিক্ষার বাহন' শীর্ষক প্রবন্ধে মাতৃভাষার মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থার কথাই বলেন। কিন্তু এই দেশীয়তার কথা যেমন ভাবছেন, তেমনি শিক্ষার বিশ্বমানবতার কথাও মনে জাগছে।

"শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগের সূত্র করে তুলতে হচ্ছে। এখানে সর্বজাতিক মনুষ্যচর্চার কেন্দ্র স্থাপন

করতে হবে—স্বজাতির সংকীর্ণতার যুগ শেষ হয়ে আসছে—ভবিষ্যতের জন্য। বিশ্বজাতিক মহামিলন যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। তার প্রথম আয়োজন এ বোলপুরের প্রান্তরেই হবে।"

বিশ্ব ও ভারত—এক বাক্যের মধ্যে ধরা পড়েছে—মনের মধ্যেও তার নীড় রচনা চলছে। খুব দীনভাবে আশ্রমের দক্ষিণে কয়েকটি লোককে সাক্ষী করে, 'বিশ্বভারতী'র ভিত্তি স্থাপিত হলো—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম সংস্থাপনের আঠারো বৎসর পরে ১৯১৮, ডিসেম্বর ২৩। ১৩২৫, ৮ই পৌষ)।

কবির স্বপ্ন শান্তিনিকেতন হবে ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র—সর্ব-ভারতীয় শিক্ষা কেন্দ্র সংস্থাপনের ভাবনা তখনো দেশে সুস্পষ্ট হয়নি। এই সব কথা বলতে চান শিক্ষিত জনতার কাছে। সুযোগ এলো। মহীশূর রাজ্যের বঙ্গলুর নাট্য-নিকেতন থেকে নিমন্ত্রণ এলো—চললেন দক্ষিণ ভারত। বঙ্গলুর, মহীশূর, উটকামণ্ড, পালঘাট, সালেম, তিরুচিনপল্লী, কুম্ভকোনম, মাত্বরা, মদনাপল্লী প্রভৃতি শহর ঘুরলেন—কত বিষয় সম্বন্ধেই বক্তৃতা করতে হলো।

"বক্তৃতার ঘূর্ণির মধ্যে পড়েচি। আসর খুব জমে উঠেচে। কিন্তু আরো বক্তৃতা লিখতে হবে। তার জন্য বই চাই। পত্রপাঠ আমাকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় বই পাঠিয়ে দেবে।"

কিন্তু সর্বত্রই বলছেন তিনি তাঁর বিশ্বভারতীর কথ। আদৈয়ে মিসেস অ্যানি বেসান্ত স্থাপিত ন্যাশনাল য়ুনিভারসিটির চ্যানসেলার রূপে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ভাষণ দিলেন—তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—'দি সেন্টার অব্ ইণ্ডিয়ান কাল্‌চার'।

দক্ষিণ ভারত সফর শেষে ফিরলেন কলকাতায়। সেখানে 'বিশ্বভারতী' সম্বন্ধে সর্বপ্রথম বললেন এম্পায়ার থিয়েটারে—ভাষণটি দেন ইংরেজিতে (১৯১৯, মার্চ ২৭)।

"মানব-সংসারের জ্ঞানালোকের দিয়ালি উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে

মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।....ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে।.... এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্যদিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।....ভিক্ষাজীবিতায় কখনো কোনো জাতি সম্পদশালী হইতে পারে না।....

"বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা।....

"সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীন জীবনযাত্রার যোগ আছে। সে বিদ্যালয় তাহার (দেশের) অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠা-স্থানের চতুর্দিকবর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গো-পালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায় প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্র শিক্ষক ও চারিদিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে।....

"এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্বভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম।"

এই হলো গঙ্গার গঙ্গোত্রী—বিশ্বভারতীর উৎস মুখের বাণী। তারপর এই প্রবহমান ভাবগঙ্গার ধারার সহিত মিলিত হয়েছে কত সংস্কৃতির ধারা—এখনো নব নব ধারা এসে সার্থক হচ্ছে, আপনারাও সমৃদ্ধ করছেন বিশ্বভারতীকে।

কবি আছেন শান্তিনিকেতনে। ১৩২৬ সালের বৈশাখ মাস থেকে (১৯১৯ এপ্রিল) 'শান্তিনিকেতন' নামে এক চার পৃষ্ঠার পত্রিকা বের করছেন—আমেরিকা থেকে উপহার-পাওয়া প্রেসে ছাপা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয় সম্বন্ধে লিখছেন—গান, কথিকা, শব্দতত্ত্ব, অনুবাদ-তত্ত্ব ইত্যাদি।

ইতিমধ্যে পঞ্জাবের অমৃতসহরে জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল নববর্ষের দিন। সে-সব খবর পঞ্জাবের ফৌজী আইনের কড়া শাসন ভেদ করে স্পষ্টভাবে পৌঁচছে না। মানুষের জন্মগত অধিকার খর্ব করে ইংরেজ শাসকদের মুঠোর মধ্যে ভারতীয়দের রাখবার জন্য রৌলট বিল পাশ হয়েছে। এই অনাচারের প্রতিবাদ করছেন গান্ধীজি। রাজনীতি শৌখীন বুদ্ধিজীবীর কলম-চালানো হাত থেকে, দুঃসাহসিক সন্ত্রাসবাদীদের রক্তমাখা মুঠি থেকে স'রে গিয়ে জনতার হাতে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারছেন—অশিক্ষিত জনতা গান্ধীজির অহিংসা মন্ত্রের মর্যাদা হানি করবে। এই কথাগুলি এক খোলা চিঠিতে তিনি লেখেন গান্ধীজির উদ্দেশ্যে

জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে কবি শান্তিনিকেতনে স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। প্রতিকার ও প্রতিবাদ করবার জন্য কলকাতায় গিয়ে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোকের সঙ্গে দেখা করলেন; কিন্তু কেউ এগিয়ে এলেন না। তখন কবি বড়লাট চেমস্ফোর্ডকে এই পত্রখানি লিখলেন—

"কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাদের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে।....যখন জানিলাম যে, আমাদের দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টিকে অন্ধ করিয়াছে,... তখন স্বদেশের কল্যাণ কামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিবার সংকল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহুকোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণী দান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে নিজে গ্রহণ করিব।....নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি।"

রবীন্দ্রনাথ 'স্যর' উপাধি পান চার বৎসর পূর্বে সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্মদিনে (১৯১৫)। তাঁদের পরিবারে কেউ সরকারী খেতাব কখনো গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সেই খেতাব নিয়ে যে ভুলটা করেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করলেন—সেটা ছেড়ে।

বালিকা রানুকে লিখছেন, "তোমরা তো পঞ্জাবে আছ, পঞ্জাবের দুঃখের খবর বোধ হয় পাও। এই দুঃখের তাপে আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিল।"

স্যর উপাধি ত্যাগ করে আরেকদিন লিখছেন—

"তোমার লেফাফায় তুমি আমার ঠিকানা লেখো, আমি ভাবলুম এ পদবীটা তোমার পছন্দ নয়। তাই কলকাতায় এসে বড়লাটকে চিঠি লিখেছি আমার এ 'ছার' [স্যর] পদবীটা ফিরিয়ে নিতে। আমি বলেছি বুকের মধ্যে অনেক ব্যথা জমে উঠেছিল, তারই ভার আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে—তাই এ ভারের উপরে আমার এ উপাধির ভার আর বহন করতে পারছিনে।"

বৈশাখী ঝড় বয়ে গেল দেশের উপর দিয়ে, কবির মনের উপর দিয়ে। শান্তিনিকেতনে ফিরে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে লিখছেন, "আকাশে ঘন ঘোর মেঘ, বর্ষার আয়োজন সমস্তই রয়েচে, কেবল আমি আসিনি বলেই বৃষ্টি আরম্ভ হয়নি। বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে—তারপর আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেব।"

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলেছে; তার কয়েকদিন পরেই 'বিশ্বভারতী' পঠন-পাঠন শুরু হলো—১৯১৯ সালের ৩ জুলাই। রবীন্দ্রনাথ এখন শিক্ষক—পড়াচ্ছেন ইংরেজি কাব্য—শান্তিনিকেতনের ঘরোয়া ছাত্রছাত্রী অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষক-পত্নীদের নিয়ে।

পূজাবকাশ পর্যন্ত এইভাবে কাটলো। ছুটিতে চলেছেন কলকাতায়

—যাবেন শিলঙ পাহাড়ে। "রাত এগারোটায় হাওড়ায় উপস্থিত ; এসে শুনি, হাওড়ার ব্রিজ খুলে দিয়েচে। নৌকায় গঙ্গা পার হতে হবে। মালপত্র ঘাড়ে নিয়ে গেলাম। সবে জোয়ার এসেচে—ডিঙ্গি নৌকা ঘাট থেকে একটু তফাতে। একটা মাল্লা এসে আমাদের আড়কোলা করে তুলে নিয়ে চলল। নৌকোর কাছাকাছি এসে আমাকে শুদ্ধ ঝপাস করে পড়ে গেল। আমার সেই ঝোলা পোশাক নিয়ে সেইখানে জলে কাদায় লুটোপুটি ব্যাপার। গঙ্গামৃত্তিকায় লিপ্ত এবং গঙ্গাজল অভিষিক্ত হয়ে নিশীথরাত্রে বাড়ি এসে পৌঁছানো গেল।"

শিলঙে কিছুকাল বাস করে গৌহাটি হয়ে সিলেট যান। সিলেটে হিন্দু মুসলমানরা কবিকে কী অভ্যর্থনাটা দেখালো—যেন কোনো রাজা এসেছেন।

শান্তিনিকেতনে ফিরে উঠলেন তাঁর উত্তরায়ণের পর্ণকুটীরে। সত্যই তখন দুখানি খড়ের ঘর তৈরি হয়েছে কবির ফরমাশ মতো—কাঁকরপেটা মেঝে, দরমা-আঁটা দরজা। কবির দিন কাটে ছাত্রদের সেবায়। সকালটা যায় তাঁর ক্লাসে পড়াতে, দুপুর যায় 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার লেখা লিখতে, আর পরদিন যা পড়াবেন সেই পাঠ তৈরী করতে। সন্ধ্যাবেলা যায় ছেলেদের সঙ্গে গল্পও খেলা করে।....আর অবসর সময়ে লেখেন ভানুসিংহের পত্রাবলী কাশীর ছোট রাণুকে।

আহমদাবাদে গুজরাট সাহিত্য সম্মেলনের পক্ষ থেকে গান্ধীজি কবিকে আহ্বান জানালেন। চৈত্র মাসের দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে গেলেন সেখানে। সেই কৈশোরে ছিলেন এখানে, তারপর এই প্রথম এলেন।

"আমি একান্ত আশা করি যে ইস্টারের সময় গুজরাটের রাজধানীর সৌভাগ্য হবে আপনাকে অভিনন্দন জানাবার। বিবিধ তামাসা বা আমোদ-প্রমোদের ঠেলায় আপনাকে বিব্রত যাতে না করা হয় তার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।"

আহমদাবাদের সভার কাজ হয়ে গেলে কবি সবরমতী আশ্রমে গান্ধীজির আতিথ্য গ্রহণ করে এক রাত্রি কাটিয়ে এলেন।

কাঠিয়াবাড়ের গোটা দুই স্টেট ঘুরে কবি বোম্বাই এলেন। সেখানে ১৩ এপ্রিল (১৯২০) জালিনবালাবাগের দিন স্মরণে সভা—কবির বাণীর জন্য পত্র পাঠান বোম্বাই-এর ব্যারিস্টার মিঃ এম. এ. জিন্না। রবীন্দ্রনাথ একখানি দীর্ঘ পত্র লিখে পাঠান।

"ভাই যখন মাটিতে ভাইয়ের রক্ত ঝরিয়ে, তার সে পাপকে মস্ত বড়ো একটা নাম দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে, মাটির বুকে সেই রক্তের দাগকে সে চায় তাজা রাখতে, তার ক্রোধের স্মরণ স্তম্ভরূপে,—তখন বিধাতা লজ্জায় ঢেকে দেন সে কলুষচিহ্ন, তাঁর শ্যামল শস্যের আস্তরণ বিছিয়ে তাঁর পুষ্পের অকলঙ্ক সুমধুর শুভ্রতায়।" জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিরক্ষার জন্য কথা উঠেছে—রবীন্দ্রনাথ সে প্রস্তাবে সায় দিতে পারছেন না।

বোম্বাই থেকে বড়োদা ও সুরত হয়ে কবি কলকাতায় ফিরলেন তাড়াতাড়ি। কারণ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে য়ুরোপে পাড়ি দেবার কথাবার্তায় মন উঠেছে মেতে। ১৯১২ সালের য়ুরোপ ও ১৯২০ সালের য়ুরোপ—অনেক তফাৎ হয়ে গেছে আট বৎসরের মধ্যে। চার বৎসর (১৯১৪, আগস্ট—১৯১৮, নভেম্বর) প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে বহু রাজ্য সাম্রাজ্য লোপ পেয়েছে, নূতন রাজ্য গড়ে উঠেছে। শত্রু মিত্রে সন্ধিপত্রে সহি হয়েছে, কিন্তু শান্তি আসেনি।

রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন, "য়ুরোপে লোক-সমুদ্রে যে মন্থন হয়েছে, তাতে সেখানকার যাঁরা মনীষী, যাঁরা ভাবুক তাঁরা আজ সেখানকার সমস্ত সমাজের মধ্যে মিলিয়ে অদৃশ্য হয়ে নেই। বোধহয় আজকের দিনে তাঁদের দেখতে পাওয়া সহজ। (তাঁদের) চিন্তার স্পর্শ পাওয়া যাবে। সর্বমানবের সমস্যা যাঁরা সমাধান না করবেন, তাঁরা নিজের দেশের সমস্যার কোনো কিনারা করতে পারবেন না।"

ইংলণ্ড পৌঁছলেন সপরিবারে। পুরাতন বন্ধুরা দেখা করতে

এলেন,—ভোজসভায়, চায়ের মজলিসে মিলিতও হচ্ছেন। কিন্তু সকলেই যেন কাঁচের আড়াল থেকে কথাবার্তা বলছেন—আন্তরিকতার অভাব অনুভব করছেন। অক্সফোর্ডে এক সভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে—ব্রিটিশ রাজকবি রবার্ট ব্রিজেস্ এর সভাপতি হবার কথা। শেষ মুহূর্তে তিনি সভায় এলেন না। কবি বুঝতে পারলেন জালিনবালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ-রাজ কর্তৃক প্রদত্ত 'স্যর' উপাধি প্রত্যাখানটা স্বভাব-রাজভক্ত ইংরেজের আঁতে লেগেছে—তারা ভারতীয় কবিকে ক্ষমা করতে পারছে না; তাই সকলেই পাশ কাটাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন বিলাতে, তখন পার্লামেন্টে পঞ্জাবের হাঙ্গামা নিয়ে আলোচনা চলছে। সাময়িক পত্র-পত্রিকার মন্তব্য পড়ে, লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে, ভারত-সচিব মণ্টেগুর সঙ্গে দেখা করে, কবি বুঝলেন ভারতের কোনো সুরাহার আশা নেই। সাধারণ ইংরেজ ভাবছে জেনারেল ডায়ার ও ছোটলাট মাইকেল ওডায়ার ভারতকে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করেছেন! বিলাতের এই আবহাওয়া অসহ্য বোধ হচ্ছে।

বিলাত থেকে এন্ডরুজকে শান্তিনিকেতনে এক পত্রে লিখছেন—"ভারতের প্রতি এদেশে শাসক-সম্প্রদায়ের প্রকৃত মনোভাব নিদারুণরূপে প্রতিফলিত হয়েছে—পার্লামেন্টের দুটি কামরাতেই আলোচনা থেকে যে-কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা এই যে, এ দেশে যাদের মধ্য থেকে আমাদের শাসনকর্তারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন, তাঁদের আমলারা আমাদের উপর যত দানবীয় অত্যাচারই করুক না কেন, তাতে তাঁদের মনে কোনো রকম বিক্ষোভের সঞ্চার হয় না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী স্পষ্টই প্রমাণ করছে যে, আমাদের সত্যিকার মুক্তি রয়েছে আমাদের আপন হাতে। আমাদের জাতীয় মুক্তির পথে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টিতেই যাদের আত্মস্বার্থ-সংরক্ষণের নির্দেশ, তাদেরই দয়ার উপর নির্ভর করে জাতীয় সাধনার সুলভ সিদ্ধির সন্ধান,

আমাদের চরিত্রবলের দীনতারই পরিচায়ক হবে মাত্র। শুধু আত্মত্যাগ ও নিরতিশয় দুঃখ বরণের দ্বারাই আমরা পাব সাফল্যের সন্ধান।"

অত্যন্ত বিরক্ত মনে ইংলণ্ড ত্যাগ করে এলেন ফ্রান্সে (১৯২০)। প্যারিস অপরিচিত নগরী। ভাগ্যক্রমে কাহ্‌ন নামে এক ধনী উদার ইহুদী, শহরতলীতে সীন্ নদীর তীরে তাঁর নন্দনকাননতুল্য বাটিকায় কবি ও তাঁর সঙ্গীদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ভারি আনন্দে আছেন।

একদিন উত্তর ফ্রান্সের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখতে গেলেন মোটর কার করে। কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই—গাছপালা কঙ্কালের মতো খাড়া—ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ—ইতস্ততঃ কামানের গোলার গভীর গর্ত এখনো ভরাট হয়নি। এ কী শ্মশান দৃশ্য! কবির মনে হচ্ছে—এই কি সভ্যতার পরিণাম।

প্যারিসে অনেক মনীষীর সঙ্গে দেখা হলো—দার্শনিক আঁরি বের্গসঁ, ঐতিহাসিক অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি, সাহিত্য-রসিক কঁতেস নোয়াই, শিল্পী আঁদ্রে কার্পেলেস প্রভৃতি। প্যারিস থেকে এলেন হল্যাণ্ডে—পক্ষকাল থাকলেন—বড় বড় শহরে বক্তৃতা হলো।

"এই দুই সপ্তাহে য়ুরোপ তার দাক্ষিণ্যে আমার মনকে পূর্ণ করেছে। আমাদের এবারের সফরে ইউরোপ ঘনিষ্ঠতর ভাবে আমাদের কাছে এসেছে। এখন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে শান্তিনিকেতন সমস্ত পৃথিবীর সম্পত্তি। আমাদের এই মহান সত্য উপলব্ধি করে তার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।"

বেলজিয়ামে ব্রুসেলসের প্রধান বিচারালয়ের হলে কবির ভাষণ হলো—একজন দর্শক লিখেছেন—

"ভারতের ঋষি—ভারতের বিশুদ্ধ মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার গতির তুলনামূলক বর্ণনা করেন।"

এবার আমেরিকা চলেছেন—এটা তৃতীয় সফর। নিউইয়র্ক তো পৌঁছলেন—পিয়ার্সনের সঙ্গে উঠেছেন হোটেলে। —'একদিনেই আমরা এখানে যা খরচ করেছি, ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে এক সপ্তাহে তা ব্যয়িত হতো।'

আমেরিকায় কোনো আহ্বান নেই, পত্রিকাওয়ালারা রবীন্দ্র-নাথের পৌঁছানর খবরটা দিয়েছে, কিন্তু আর কিছু লিখছে না। হার্ভার্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আরও দুই এক জায়গায় দুই একটা বক্তৃতা হচ্ছে বটে—কিন্তু কোনো উৎসাহ নেই কোথাও। এক সভার পর একজন মার্কিন অধ্যাপক তাঁকে শুধোলেন—শান্তি-নিকেতন সম্বন্ধে ব্রিটিশ সরকারের মনোভাবটা কী রকমের। এই একটা কথাতেই কবি বুঝে নিলেন—তাঁর 'স্যর' উপাধি ত্যাগের বার্তাটা তারে তারে স্বাধীনতার পীঠস্থান আমেরিকায় এসে পৌঁচেছে। মহাযুদ্ধে ইংরেজের মিতা আমেরিকানরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনবে না। আমেরিকায় পাঁচ মিলিয়ন ডলার তোলার স্বপ্ন ভেঙে গেল—কেউ তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্বমানবতা শোনবার জন্য উৎসুক নয়। যাহোক সে দেশ ছাড়ার কিছু পূর্বে টেক্সাস স্টেটে বক্তৃতা সফরের ব্যবস্থা হলো। পনেরোটা দিনের রাত কাটে রেলগাড়ির পুলম্যান কামরায়, দিন কাটে হোটেলের খাঁচায় ও বক্তৃতা মঞ্চে। তবু এতেও আরাম পাচ্ছেন—নিউইয়র্কের দুঃস্বপ্নময় দিনগুলির স্মৃতি ভুলতে চাইছেন।

মাস চারেক আমেরিকায় বাস করে কবি সদলে ইংলণ্ডে ফিরলেন। যে ইংলণ্ডকে কিছুকাল পূর্বে অত্যন্ত বিরক্ত চিত্তে ত্যাগ করেছিলেন, লণ্ডনে এসে লিখছেন—

"ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে আমাদের নানা অভিযোগ সত্ত্বেও, আমি তোমাদের দেশকে ভালবাসি; এদেশ আমাকে দিয়েছে আমার কয়েকজন বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।"

লণ্ডন থেকে প্যারিসে এলেন এরোপ্লেনে—জীবনে এটা কবির

নূতন অভিজ্ঞতা। এর পর শুরু হলো মধ্য য়ুরোপ সফর—স্ট্রাসবুর্গ, জেনিভা, লুসার্ন হয়ে জারমেনির ডার্মস্টার্ট, হামবুর্গ।

জেনিভাতে কবির জন্মদিন পড়লো—ষাট বৎসর পূর্ণ হলো (১৯২১, ৬ মে)। কবির জন্মদিনে জারমেনির সাহিত্যিকরা কবির বিশ্বভারতীর জন্য বিপুল জারমান গ্রন্থরাশি উপহার দিলেন।

"এবার আমার জন্মদিন এখানেই হল। মনে হচ্ছে, দেশে এক-দিন জন্মেছিলুম, সে জন্ম বহু দূরে পড়ে গেছে।....য়ুরোপ মহাদেশে আমার ঘর যে এমন করে বাঁধা হয়ে গেচে তা আমি এখানে আসবার আগে কল্পনা করতে পারিনি।....ষাট বছর আগে একদিন যখন বাংলা দেশে জন্মেছিলুম, তখন মর্ত্য-জন্মের যে অসীম সম্পদ লাভ করেছিলুম, সে-ও কি হিসাব করে ঠিক বোঝা যায়—এও তেমনি, বিদেশীর কাছ থেকে এই যে ভালবাসা পাচ্ছি এর কি পুরো দাম কোনো দিন দিয়েছিলুম? আমার দ্বিতীয় জন্মের এই যে অজস্র দান পেলুম, জননী ধরিত্রীর এই আশীর্বাদ আমি নত হয়েই গ্রহণ করছি—এতে আমার কোনো অহংকার নেই।"

জারমেনি হয়ে গেলেন উত্তর য়ুরোপে—ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার পর ছাত্ররা মশাল জ্বেলে শোভাযাত্রা করে কবিকে তাঁর হোটেলে পৌঁছে দিল। তারপর চললো তাদের গানের ফোয়ারা অনেক রাত পর্যন্ত।

সুইডেনে এবার। এখান থেকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সুইডিশ আকাদামির নিয়মানুসারে কবিকে ভাষণ দিতে হলো। উপ্‌সালার আর্চবিশপ বললেন—'সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় তাঁকেই যিনি একাধারে শিল্পী ও দ্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে যেমন এই দুইয়ের সমন্বয় হয়েছে তেমন আর কারও মধ্যে দেখা যায় নি।'

এই আর্চবিশপ তাঁর উপ্‌সালা শহরের প্রাচীন খৃস্ট ভজনালয়ে কবিকে বেদী থেকে ভাষণ দানের ব্যবস্থা করলেন। কী সম্মানটাই পাচ্ছেন!

জারমেনিতেও সেই অভ্যর্থনা। বার্লিনের বক্তৃতা-সভায় জনতার ভিড় ইতিহাস হয়ে আছে। ডার্মস্টার্টে রবীন্দ্র সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হলো। সেখান থেকে প্রাগ্ হয়ে ফ্রান্সে ফিরলেন ও তারপর দেশে ফিরলেন। এবার য়ুরোমেরিকার সফরে চৌদ্দ মাস কাটে। তার মধ্যে চার মাস কাটে আমেরিকায়।

রবীন্দ্রনাথের এবার সফরের সময়টা হচ্ছে গান্ধীজি প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সমকালীন। সে আন্দোলনের তরঙ্গ শান্তিনিকেতনের শান্তম্ শিবম্ দ্বৈতম্‌কে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কবি সব খবরই পাচ্ছিলেন। তিনি বিদেশ থেকে লেখেন—"শান্তিনিকেতনকে রাজনীতির ধূলার ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষা করতে হবে। এ কথা ভুললে চলবে না যে আমাদের মিশন্ রাজনীতিক নয়। আমি যখন রাজনীতি করি, তখন আমি শান্তিনিকেতনের কেউ নই।"

কবি পুনরায় লিখছেন—"ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক্—সেইখানে পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক্,—সেই জায়গা হোক্ শান্তিনিকেতন।"

দেশে ফিরে গান্ধীজির প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ নীতির সমালোচনা না করে পারলেন না। দেশের লোক তখন এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভের যাদুমন্ত্রে বিশ্বাস করে চরকা কাটছে, স্কুল কলেজ ছাড়ছে। অনেক মহৎ ব্যক্তিও সর্বস্ব ত্যাগ করে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কবি লিখলেন, —"স্বরাজ গড়ে তোলবার তত্ত্ব বহু বিস্তৃত, তার প্রণালী দুঃসাধ্য এবং কালসাধ্য। তথ্যানুসন্ধান ও বিচার-বুদ্ধি চাই। তা'তে যারা অর্থশাস্ত্রবিদ্ তাদের ভাবতে হবে, যন্ত্রতত্ত্ববিদ্ তাদের খাটতে হবে; শিক্ষাতত্ত্ববিদ্, রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ সকলকেই ধ্যানে এবং কর্মে লাগতে হবে—অর্থাৎ দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগাতে হবে।"

কবি সেদিন যা বললেন, তার নির্গলিত অর্থ হচ্ছে—ন্যাশনাল প্লানিং সার্বিক কল্যাণ কর্মের পরিকল্পনা গ্রহণ।

কিন্তু কবি জীবনে 'এহ বাহ্য'। রাজনীতির ভাবনা মন থেকে কখন সরে গেল—বর্ষার আবির্ভাবে সুরলক্ষ্মী দেখা দিলেন। সুরের বৈভব নিয়ে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব করলেন কলকাতায় তাঁদের বাড়িতে। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই উৎসব অনুষ্ঠান করার জন্য তাঁকে ঘরে-বাইরে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। বাংলা দেশের এই প্রথম রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জলসা।

আমেরিকা থেকে শুরু হয়েছিল কেজো জীবনের ঘূর্ণিপাক—দেশে এসেও সেই আবর্তে পড়ে যান। বিশ্বভারতীর কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে মন—মুক্তি পেলো প্রথমে বর্ষামঙ্গল ক'রে, তারপর 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাগুচ্ছ লিখে।

"আমেরিকার বস্তু-গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম। কিছুকাল আমেরিকার প্রৌঢ়তার মরুপারে ঘোরতর কার্যপটুতার পাথরের দুর্গে আটকা পড়ে গিয়েছিলুম।.... সেদিন আবিষ্কার করেছিলুম অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনার সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্য, মুক্ত করবার জন্য।"

"দায়িত্ববোধরূপ ব্যাধি মানুষের বয়স্কতাকে কড়া করে পাকা করে তোলে, সে অবস্থায় সে খেলাকে অবজ্ঞা করতে থাকে, এবং খেলার সঙ্গে কাজের চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়ে কর্তব্য পালন করছে বলে গৌরব বোধ করে।" কবির ভাবনা তাঁর বিশ্বভারতী, সেখানেও "খেলার চেয়ে দায়িত্ব পাছে বড় হয়ে ওঠে।"

কিন্তু বৎসর শেষ না হতেই খেলা ছেড়ে দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে হলো। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানরূপে পাকাপোক্ত করবার জন্য সংবিধান প্রস্তুত ক'রে সংসদ পরিষদ গড়ে, সমিতি উপ-সমিতি

খাড়া করে কোষাধ্যক্ষ ট্রাস্টি মনোনীত করে—পাবলিকের হাতে বিশ্বভারতী তুলে দিতে হলো—কবি হলেন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য। ব্রহ্মচর্যাশ্রম সংস্থাপনের বিশ বৎসর পর ও বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠার তিন বৎসর পর বিশ্বভারতী সরকারী আইন অনুসারে একটা রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠান বলে গঠিত হলো। (১৯২১, ২৩ ডিসেম্বর)।

এই উৎসবে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতিরূপে দীর্ঘ ভাষণে এই আন্তর্জাতিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্মকথাটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—

"আজ এখানে বিশ্বভারতীর অভ্যুদয়ের দিন। বিশ্বভারতীর কোষানুযায়িক অর্থের দ্বারা আমরা বুঝি যে-'ভারতী' এতদিন অলক্ষিত হয়ে কাজ করছিলেন, আজ তিনি প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ধ্বনিগত অর্থও আছে—বিশ্ব ভারতের কাছে এসে পৌঁছবে। সেই বিশ্বকে ভারতীয় করে নিয়ে আমাদের রক্তরাগে অনুরঞ্জিত ক'রে, ভারতের মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত ক'রে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপস্থিত করব। সেইভাবেই বিশ্বভারতী নামের সার্থকতা আছে।"

তিন বৎসর পূর্বে যখন বিশ্বভারতীর সূচনা হয়, তখন কবি ভেবেছিলেন সর্বভারতীয় সংস্কৃতি-চর্চার কেন্দ্র হবে শান্তিনিকেতনে। তারপর কবি য়ুরোমেরিকা সফর করে এলেন—মনে হলো সেখানকার জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় বিদ্যার সংযোগ করতে হবে। তারও পরে যখন ফ্রান্স থেকে সিলভ্যাঁ লেভি এসে চীন তিব্বতের ভাষা ও সাহিত্য-চর্চা শুরু করলেন, তখন প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের যোগের কথা এসে পড়লো।

"গাছের বীজ ক্রমে ক্রমে প্রাণের নিয়মে বিস্তৃতি লাভ করে। সে বিস্তার এমন করে ঘটে যে, এই বীজের সীমার মধ্যে তাকে আর ধরেই না। তেমনি প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা

বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল।" এটি কবি বলেন বিশ্বভারতী স্থাপন-উৎসব দিনেই।

শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী' উৎসর্গিত হবার মাস দেড়েকের মধ্যে (১৯২২, ৬ ফেব্রুয়ারী) শ্রীনিকেতনে পল্লীসংগঠন কেন্দ্র স্থাপিত হলো। এর কার্যভার নিয়ে আসলেন ইংরেজ যুবক লেনার্ড এলমহার্স্ট; আর প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করবার দায় নিলেন আমেরিকার এক ধনী কন্যা যিনি কালে শ্রীমতী এলমহার্স্ট হন। কবির বহুকালের স্বপ্ন বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সংস্কার সাধন—সেটি সফল করতে এলেন ইংরেজ আমেরিকান। শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে কবি নিরুদ্বেগ হলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ব্যয়ভার? সে তো তাঁকেই বহন করতে হবে—তাঁকেই টাকার সন্ধান করতে হবে। এই অর্থ সংগ্রহে আর একজনের সহায়তা পেয়েছিলেন—তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এনড্রুজ।

বিশ্বভারতীর জন্য ভিক্ষা সফরে পশ্চিম ভারতে ঘুরছেন। "আমি ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হাতে নিয়ে বললে ঠিক হয় না, কণ্ঠে নিয়ে। এ বিদ্যা আমার অভ্যস্ত নয়, তৃপ্তিকরও নয়। যখন মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন বিশ্বভারতী মরীচিকা বলে মনে হয়।"

কিন্তু এই মরীচিকার পিছনে কুড়ি বৎসর, জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত ছুটতে হয়েছিল।

বিশ্বভারতীর ভাবনার বাইরেও অসংখ্য সমস্যার কথা মনকে উত্তেজিত করে তোলে। খিলাফতী প্রশ্নকে ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে কংগ্রেস ভেবেছিলেন যে হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়ে স্বাধীনতা আনবে। কিন্তু দেখা গেল ধর্মচেতনা উন্মত্ত ধর্মমূঢ়তায় রূপান্তরিত হতে বেশি সময় লাগে না। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ নানাস্থানে, নানা অজুহাতে দেখা দিচ্ছে।

"আমরা স্বাধীনতা চাই, কিন্তু যে বুদ্ধি আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া নিঃশক্ত করিয়াছে—সেই ভেদ-ছিদ্র বন্ধ করিতে না পারিলে শনি সেই পথেই প্রবেশ করিয়া ভরা-নৌকা ডুবি করিতে পারে—সে

সম্বন্ধে চিন্তার প্রয়োজন।” “সকলের চেয়ে গভীর আত্মীয়তার ধারা নাড়ীতে বয়, মুখের কথায় বয় না।” “হিন্দু, বিপুল অথচ দুর্বল।”

কবি বললেন, “শুধু চরকায় সুতো কাটলে সমস্যার সমাধান হবে না। দুশো বছর আগে চরকা চলেছিল, তাঁতও বন্ধ হয়নি, সেই সঙ্গে অগ্নিও দাউ দাউ করে জ্বলেছিল। সেই আগুনের জ্বালানি কাঠ হচ্ছে ধর্মকর্মে অবুদ্ধির অন্ধতা।”

“মনের মধ্যে নিরবধি শিকল গড়ার কারখানা
একটা বাঁধন কাটে যদি বেড়ে ওঠে চারখানা।
কেমন করে নামবে বোঝা,
তোমার আপদ নয়তো সোজা,
অন্তরেতে আছে যখন ভয়ের ভীষণ ভাবখানা।

রাতের আঁধার ঘোচে বটে বাতির আলো যেই জ্বালো।
মূর্ছাতে যে আঁধার ঘটে রাতের চেয়ে ঘোর কালো।
পর তো আছে লাখে লাখে কে তাহাকে নিঃশেষে
ঘরের মধ্যে পর যে থাকে, পর করে দেয় বিশ্বে সে।
কারাগারের দ্বারী গেলে
তখনি কি মুক্তি মেলে?
আপনি তুমি ভিতর থেকে চেপে আছ দ্বারখানা।
লোভে ক্ষোভে উঠিস্ মাতি,
ফল পেতে চাস রাতারাতি
মুঠোরে তোর করবে ফুটো, আপন খাড়ার ধারখানা।
ঝড় তুফানে ঢেউএর মারে
তবুও তরী বাঁচতে পারে,
সবার বড়ো মার যে তোমার ছিদ্রটার ঐ মারখানা।”

বিশ্বভারতীর জন্য পশ্চিম ভারত ঘুরলেন। এবার চললেন চীন দেশে। চীনদেশ সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে গেছেন অধ্যাপক লেভি।

বর্মা ও মালয় উপদ্বীপের বন্দর শহরের উপর চোখ বুলিয়ে চীনের শাংহাই বন্দরে কবি ও তাঁর সাথীরা পৌঁছলেন (১২ এপ্রিল, ১৯২৩) শাংহাই আন্তর্জাতিক বন্দর—তখন সেখানে জাপানী, মার্কিনী, ইংরেজ প্রভৃতির বেজায় দাপট—চীনারা আছে কোণঠাসা—'নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে।'

নানা সভা সমিতি থেকে কবি সম্বর্ধনা হচ্ছে। দুই একটা সভায় কবির ভাষণ শুনে বিদেশীরা বলতে শুরু করলেন—ভারতবর্ষ কখনো বাইরের সঙ্গে কোনো রকমের যোগ স্থাপনের চেষ্টা তো করেনি। রবীন্দ্রনাথের এই সফরের উদ্দেশ্য কী! কবি বললেন, প্রাচীন ভারতের সঙ্গে চীনের যে সম্বন্ধ ছিল, যার কথা ভারত ভুলে গেছে, সেই ভুলে যাওয়া সম্বন্ধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি চীনে এসেছেন—নিঃস্বার্থ মানব প্রেমের জন্য, আর কিছুর জন্য নয়।

শাংহাই থেকে ইয়াংসি নদীপথে নানকিঙ্ হয়ে কবি ও তাঁর সঙ্গীরা পেকিঙ যাত্রা করলেন। পেকিঙ স্টেশন পৌঁছিয়ে দেখেন সে কী বিরাট জনতা অপেক্ষা করছে! চারিদিক থেকে পুষ্পবৃষ্টি ও দেশের রীতি অনুসারে কান-ফাটানো পট্‌কাবাজির আওয়াজ করে কবি-সম্বর্ধনা হলো। বিদেশী পত্রিকাওয়ালারা তো অবাক্! এর আগে বক্তৃতা দিতে ইংলণ্ড থেকে বার্টান্‌ড রাসেল, আমেরিকা থেকে জন ডিউই এসেছেন; কিন্তু এ রকম ব্যাপার তো কেউ দেখেনি। এর কারণ কি?

'Men have come to China and have gone, yet none of them has been so enthusiastically received. What is the reason?'

পেকিঙে বহু ভাষণ দিলেন, যা কিছু দর্শনীয় সব দেখলেন। এমনকি মাঞ্চু সম্রাটদের যে নিষিদ্ধ পুরীতে বন্দী সম্রাট-সম্রাজ্ঞীরা বাস করতেন—সেখানেও কবির আহ্বান হলো। সেই পুরীর শিল্প-শোভা দর্শন, তখনো সাধারণের কাছে নিষিদ্ধ।

পেকিঙে কবির বিরোধী দলও ছিল—"নিছক সম্মান পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। সেখানেও একদল আছে, তা-ও বলি, তাদের দল খুব ভারী নয়—তারা বললে—'এ লোকটি ভারতবর্ষ থেকে এসেছে—আমাদের মাথা খারাপ করতে। এখন আমাদের এ সমস্ত কথা, ভারতবর্ষের বাণী, বৌদ্ধধর্ম যা দিয়েছে, শুনতে পারিনে। যাতে ক্ষতি হয়েছে, গায়ের জোর কমিয়ে দিয়েছে, হিংসা প্রভৃতি খর্ব করেছে'।"

পেকিঙে কবির জন্মোৎসব হলো মহাসমারোহে। 'চিত্রা' চীনা-ভাষায় অভিনীত হলো। কবিকে চীনারা চীনা নাম, চীনা পোশাক দিলো। জীবন-সন্ধ্যায় এই কথাটি স্মরণ করে লেখেন—

একদা গিয়েছি চীনের দেশে
অচেনা তাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন তুমি আমাদের চেনা ব'লে।
ধরিনু চীনের নাম, পরিনু চীনের বেশ বাস।
এ কথা বুঝিনু মনে
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই এ নব জন্ম ঘটে।

চীন সফর করে কবির মনে যে কথাটি জাগে, তাতে ভাষা দেন—কবির সেক্রেটারী মিঃ এলমহার্স্ট। তিনি লেখেন—

'The future of the world already lies in the hands of Asia ; Russia, China and India will have to decide what future is to be.'

'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এশিয়ার হাতে এসে গিয়েছে। রাশিয়া, চীন ও ভারতকে স্থির করতে হবে সেই ভবিষ্যৎ কোন্ পথ নেবে।'

চীন থেকে কবি জাপানে এলেন। ১৯১৬ সালে প্রথম আসেন, তারপর এই ১৯২৩ সালে। দেখা করলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বার জাপান যাত্রার প্রাক্কালে রাসবিহারী কবির আত্মীয় পি. এন্. টেগোর নাম নিয়ে ছদ্মবেশে কলকাতা থেকে পলায়ন করেন। সে-সব কথা কি আর রবীন্দ্রনাথ জানতেন না?

দেশের ফেরার কিছুকাল পরে শাংহাই মহানগরীতে সর্বপ্রথম এসিয়ান কন্ফারেন্স আহুত হয় বিপ্লবীদের উদ্যোগে। সমসাময়িক এক মার্কিনী পত্রিকা বললেন, রবীন্দ্রনাথের পূর্ব এশিয়া সফর থেকে এই সম্মেলন আহ্বানের প্রেরণা।

'Inspiration for the movement is acknowledged to Tagore, whose teachings permeate the issued declarations.'

সোজা কথায়—এশিয়ান বিপ্লবীরা রবীন্দ্রনাথের এশিয়ান ঐক্যের বাণী দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে এই কন্ফারেন্স আহ্বান করেছিলেন।

ইংরেজিতে—China to Peru—অদ্ভুত দূরত্ব সূচক প্রবাদ বাক্য আছে। বর্ণে বর্ণে সত্য হলো রবীন্দ্রনাথের বেলায়। পেরু যাবার নিমন্ত্রণ পেলেন যখন তিনি জাপানে ছিলেন।

পেরু দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীশ ভাষীদের এক রিপাবলিক রাষ্ট্র—একশ' বৎসর পূর্বে ১৮২৪ সালে ৯ ডিসেম্বর তারা স্পেনীশ বাহিনীদের এক যুদ্ধে পরাজিত করে স্বাধীন হয়। শতাব্দীকাল পরে ১৯২৪ সালের ৯ ডিসেম্বর সেই দিনটি স্মরণ করবার জন্য রাজধানী লিমা-য় উৎসব—সেই উৎসবে তারা ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথকে চায়।

দু'মাস দেশে ছিলেন, তার মধ্যে 'রক্ত করবী' নাটিকা বের হলো প্রবাসী পত্রিকায় (১৩৩১ আশ্বিন) আর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হলো বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লিতে। দেড় বৎসর পূর্বে শিলং বাস কালে এর প্রথম খসড়া করেন—'যক্ষপুরী' নাম দিয়ে।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কবি দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করলেন—য়ুরোপ পর্যন্ত সঙ্গী হলেন রথীন্দ্রনাথরা।

কিছুকাল থেকে কবির শরীরটা খারাপ—ইনফ্লুয়েঞ্জায় বেশ দুর্বল করে দিয়েছে। তবুও চললেন—ভাবলেন, চলার আনন্দে ভালো হয়ে যাবেন। কলোম্বোতে গিয়ে জাহাজ ধরলেন। "অনেকবার দূর দেশে যাত্রা করেছি, মনের নোঙরটা তুলতে খুব বেশি টানাটানি করতে হয়নি। এবার সে যেন কিছু জোরে ডাঙা আঁকড়ে আছে।....ঘাটের থেকে কিছু দূর গেলেই এই পিছুটানের বাঁধন খসে যাবে। তরুণ পথিক বেরিয়ে আসবে রাজপথে।"

ষ্টীমারে বসে লিখছেন পূরবীর কবিতা ও পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি।

ফ্রান্সে এসে জাহাজ বদল করে মিঃ এলমহার্স্টকে সঙ্গে নিয়ে 'আণডো' জাহাজে রওনা দিলেন দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা অভিমুখে।

'বিষুবরেখা পার হয়ে চলেছি—এমন সময় হঠাৎ শরীর গেল বিগড়িয়ে, বিছানা ছাড়া গতি রইল না, শক্তিহীন দিন, আর নিদ্রাহীন রাত। আপনার বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে—মাঝে মাঝে মনে হতো, এটা স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ।"

"অন্ধ কেবিন আলোয় আঁধার গোলা,
বন্ধ বাতাস কিসের গন্ধে ঘোলা।....
হেন কালে ক্ষুদ্র দুঃখের ক্ষুদ্র ফাটল বেয়ে
কেমন করে এল হঠাৎ ধেয়ে

বিশ্বধরার বক্ষ হতে বিপুল দুঃখের প্রবল বন্যা ধারা ;
এক নিমেষে আমারে সে করলে আত্মহারা।"

আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিস্ যখন পৌঁছলেন, তখন শরীর এমন খারাপ যে রেলপথে লিমা যাওয়া অসম্ভব। ডাক্তারদের পরামর্শে বিশ্রাম নিতে হলো। এখানে কবির এক ভক্ত নারী ভিকটোরিয়া-ও-কামেপা তাঁর শহরতলীর বাড়িতে কবিকে নিয়ে গেলেন। কী সেবা যত্ন পেলেন !

"প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করে দিলে, নারী।
মাধুর্যসুধায় ; কত সহজে করিলে আপনারি
দূর দেশী পথিকেরে ; ....
জানি না তো ভাষা তব, হে নারী, শুনেছি তব গীতি,
'প্রেমের অতিথি কবি, চিরদিন আমারি অতিথি।'

এই মহীয়সী নারীকে স্মরণ করেছেন পূরবীর বহু কবিতায়—তারপর সমস্ত কাব্যটি 'বিজয়া'র করকমলে উৎসর্গ করে তাঁকে অমর করে গেছেন। মৃত্যুর পূর্বে বিজয়ার কথা কবি প্রায়ই বলতেন—

"বিদেশের ভালবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
ভাষা যার জানা ছিল নাকো,
আঁখি যার কয়েছিল কথা
চিরদিন রাখিব গাঁথিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।
জাগায়ে রাখিবে চিরদিন
সকরুণ তাহার বারতা॥ (শেষ লেখা)

আর্জেন্টিনা বাসকালে দেশের কোনো খবর পান না—স্পেনীশ ভাষার কাগজ সেদেশে। এক পত্রে জানলেন ১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসের অর্ডিনান্সে বহু কংগ্রেসকর্মী অন্তরীণাবদ্ধ হয়েছে—

"ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
টুটল কত বিজয় তোরণ, লুটল প্রাসাদ চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধূলোয় হল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে
তখনো এই বিশ্বদুলাল ফুলের সবুর সবে।
রঙিন কুর্তি, সঙিন মূর্তি, রইবে না কিচ্ছুই ;
তখনো এই বনের কোণে ফুটবে লাজুক জুঁই।....
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয় ;
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।"

আর্জেন্টিনা থেকে ইতালীয় জাহাজে করে কবি এলেন ইতালির বন্দর জেনোয়ায়। তখন ইতালিতে (১৯২৪) মুসোলিনীর দুর্দান্ত প্রতাপ। মিলানোতে বক্তৃতা হলো এবং তারপর নানা জায়গা থেকে আসতে লাগলো বক্তৃতার আহ্বান। কিন্তু কবির ভালো লাগছে না ঘুরতে ; তাই ভেনিসে এসে স্টীমার ধরে দেশের দিকে রওনা দিলেন।

দেশে এসে দেখেন, যারা স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই সুভাষচন্দ্র প্রমুখ স্বরাজ্যদলের সকলেই জেলে, নয় অন্তরীণাবদ্ধ। এখন চরকা কাটা ও খদ্দর পরায় পর্যবেসিত হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন।

গান্ধীজি এলেন বাংলা দেশে খদ্দর-নীতি প্রচার করতে। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে খদ্দরের নীতি

বুঝাতে চেষ্টা করলেন। বলা বাহুল্য কেউ কাউকে দলে টানতে পারলেন না।

দেশের উগ্র খদ্দর-ভক্ত-নেতাদের চরকাকাটা নিয়ে বেশ একটু বাড়াবাড়ি করতে দেখে কবি আর নীরব থাকতে পারলেন না। তিনি এই মধ্যযুগীয় অর্থনীতিবাদের প্রতিবাদ করলেন। "সকল মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছা করেন নি। কিন্তু সমাজবিধাতারা কখনো কখনো সেই রকম ইচ্ছা করেন।

....খুব সহজে এবং খুব শীঘ্র স্বরাজ পাওয়া যেতে পারে—এ কথায় যারা মেতে ওঠে, তারা বুদ্ধি নেই বলেই যে মাতে তা নয়, লোভে পড়ে বুদ্ধি খাটাতে ইচ্ছে করে না বলেই তাদের এত উত্তেজনা।"

গান্ধীজির খিলাফতী ও খদ্দর নীতি কোনোটাই রবীন্দ্রনাথের সমর্থন না পাওয়াতে দেশের লোক কবির উপর প্রসন্ন হতে পারলো না।

ষষ্ঠ স্তবক

(১৯২৬-১৯৪১)

মাস পাঁচ দক্ষিণ আমেরিকা সফর করে দেশে ফিরেছেন ১৯২৫ সালের গোড়ায়। 'পূরবী'র ছন্দোময় কবিতার পালা শেষ হয়েছে; এবার বসন্তকে 'সুন্দর' বলে গান দিয়ে অবসান করলেন। অন্য সাহিত্য সৃষ্টির আবেগ যেন কম। খবর পেলেন পাবলিক রঙ্গমঞ্চে 'চিরকুমার সভা' অভিনয় করতে চান কলকাতার স্টার থিয়েটার। তাই নূতন করে লিখে দিলেন সেটা। মন নাটক রচনায় ঝুঁকলো—পর পর আরও ছুটো নাটক লিখলেন—'কর্মফল' গল্প নিয়ে 'শেষবোধ', 'শেষের রাত্রি' গল্পকে বাড়িয়ে 'গৃহপ্রবেশ'। গান চলছে মনের মধ্যে নিরন্তর—তাই এই নাটকগুলো গানে পূর্ণ। এই গীত-নির্ঝরে 'শেষ বর্ষণ' এলো।

বৎসরের শেষদিকে ইতালি থেকে এলেন অধ্যাপক ফর্মিকি—ভিজিটিং প্রোফেসর হয়ে। এঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ইতালিতে কিছুকাল আগে। মুসোলিনী এই অধ্যাপকের সঙ্গে বিশ্বভারতীর জন্য পাঠিয়ে দিলেন বিরাট ইতালীয় গ্রন্থরাশি। আর এলেন তরুণ অধ্যাপক তুচ্চি, তাঁর খরচ ইতালীয় সরকারই বহন করবেন জানিয়েছেন। কবি খুবই কৃতজ্ঞ। বুঝতে পারলেন না তাঁকে পাকড়াবার জন্য এই জাল বিস্তার করছেন ফাসিস্ত সরকার।

বৎসরের শেষ দিকে (১৯২৫) ভারতের দর্শনশাস্ত্রীরা কলকাতায় তাঁদের প্রথম দর্শন-কংগ্রেস আহ্বান ক'রে রবীন্দ্রনাথকে করলেন সভাপতি। কবি ও ধর্ম-সাধকরা দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ কখনো লেখেন নি। কিন্তু তাঁদের বাণীর ব্যাখ্যা ও ভাষ্য করেছেন দার্শনিকরা। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনও 'দি ফিলসফি অব্ রবীন্দ্রনাথ টেগোর' বই নিয়ে 'কবির দর্শন' বলে একটা বিষয় মেনে নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির ভাষণে উপেক্ষিত, অজ্ঞাত, ব্রাত্য জনতার ধর্মের মধ্যে যে গভীর তত্ত্বকথা রয়েছে, তারই ব্যাখ্যা করলেন। ইতিপূর্বে জনতার ধর্ম নিয়ে কেউ এমন সমজদারী আলোচনা করে নি, তাঁর ভাষণকে বলা যেতে পারে—'দি ফিলসফি অব্ দি মাসেস্।'

ঢাকায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে বছর পাঁচ (১৯২১)। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান এলো বক্তৃতার জন্য। রবীন্দ্রনাথ জগৎখ্যাতি লাভের পর ঢাকায় এলেন—সেই যৌবনে গিয়েছিলেন প্রাদেশিক সম্মেলনের সাধারণ সদস্যরূপে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণাদি দিয়ে কবি চললেন ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ও শেষকালে এলেন আগরতলা। পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই শেষ সফর।

সফরের শেষ দিকে তাঁর মনে যে গানের সুর নেমে এলো। তার রেশ বহুকাল—কখনো বন্যারূপে, কখনো ফল্গুধারায় বয়ে চলে, এমন কি য়ুরোপ ভ্রমণকালে অপ্রত্যাশিত পরিবেশেও দেখা দিয়েছে।

কলকাতায় ফেরার অল্পকাল পরেই নগরে হিন্দু-মুসমলান দাঙ্গা বেধে গেল। ভারতের নানা স্থানেই এ ব্যাধি দেখা দিয়েছে; খিলাফতী দাবী হিন্দুরা সমর্থন করেও স্থায়ী মিলন গড়ে তুলতে পারে নি।

'হিন্দুর কাছে মুসলমান অশুচি আর মুসলমানের কাছে হিন্দু কাফের—স্বরাজ প্রাপ্তির লোভেও এ কথাটা ভিতর থেকে উভয় পক্ষের কেউ ভুলতে পারে না।....ধর্ম-নিয়মের আদেশ নিয়ে মনের যে সকল অভ্যাস আমাদের অন্তর্নিহিত, সেই অভ্যাসের মধ্যেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের দৃঢ়তা আপন সনাতন কেল্লা বেঁধে আছে, খিলাফতের আনুকূল্যে বা আর্থিক ত্যাগস্বীকার সেই অন্দরে গিয়ে পৌঁছয় না।....

"বাধা আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যেই আছে; সেটা দূর করবার কথা বললে আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।"

কলকাতায় কবি স্বচক্ষে দেখেছেন ভীত জনতা আশ্রয়ের জন্য

তাঁদের বাড়িতে এসে ঢুকছে। হাঙ্গামার সূত্রপাত মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে—মুসলমানদের ভালো লাগে না বলেই হিন্দুর পক্ষে সেই কারণেই বাজনা বাজানোটা ধর্মের পক্ষে একান্ত হয়ে ওঠে।

"হিন্দু মুসলমানের সমস্যার কূল পাওয়া যায় না। লাঠালাঠির দ্বারা কোনো জিনিসের সমাধান হয় না।....আমরা নাকি ধর্মপ্রাণ জাতি। তাইতো আজ দেখছি ধর্মের নামে পশুত্ব দেশ জুড়ে বসেছে।"

"ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সে-ও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।....
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্ত-মাখানো ধ্বজা—
দেবতার নামে এযে শয়তান ভজা॥"

এই হিংসায় উন্মত্ত 'পৃথিবী'র দিকে তাকিয়ে ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ভাবনার কথা মনে হচ্ছে। তাই যখন জন্মদিনের উৎসবে অভিনয়ের জন্য 'পূজারিণী' কবিতাটি 'নটীর পূজা' নামে নাটিকায় লিখতে প্রবৃত্ত হলেন, তখন এই অহিংসার কথাই এসে গেছে ঘটনায় ও রচনায়, সঙ্গীতে ও সংলাপে। শান্তিনিকেতনে জন্মদিনে (১৯২৬ মে ৮) 'নটীর পূজা'র অভিনয় হলো।

ইতিমধ্যে ফর্মিকি ইতালিতে ফিরে গেছেন। রোম থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন ইতালি ভ্রমণের জন্য। কবির পার্ষদদের পরামর্শে কবি মহোৎসাহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। বোম্বাইয়ে ইতালীয় জাহাজে উঠে বুঝলেন যে কোনো অধ্যাপকের ব্যবস্থায় এমন রাজকীয় ব্যবস্থা হতে পারে না। পিছনে যে মুসোলিনীর হাত

আছে—তা বুঝলেন রোমে পৌঁছে। সেরা হোটেলে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। অধ্যাপক ফর্মিকি দোভাষীর কাজ করেন। আর খবরদারী করছেন যেন কোনো অবাঞ্ছিত ফাসিস্ত-বিরোধী লোক রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে না পড়ে।

মুসোলিনীর সঙ্গে দু'দিন দেখা হয়—তারপর সাংবাদিকদের কাছে কবি প্রশংসাসূচক দু'চারটে কথা কী বলেন,—তাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ইতালীয় কাগজে ঘোষিত, বিঘোষিত হলো যে কবি ফাসিস্ত ইতালি দেখে মুগ্ধ।

রোম ছাড়বার আগের দিন মুসোলিনীকে তিনি বলেন যে ক্রোচের সঙ্গে দেখা না করে কি করে ইতালি ত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ যে-নেপলস্ বন্দরে জাহাজ থেকে নেমেছিলেন, সেই নেপ্‌লস ক্রোচের বাসস্থান এবং তিনি সেখানে থাকেন অনেকটা গৃহবন্দীর মতো—এসব কবি কিছু জানতে পারেন নি। ক্রোচ ফাসিস্ত-বিরোধী বলে তাঁর এই দশা। যাই হোক্, মুসোলিনীর আদেশে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের দেখা হলো। দেখা হওয়াতে দু'জনেই খুব খুশি।

ইতালি ত্যাগ করে কবি সুইটজারলণ্ডে ভিলেন্যুভে যান—যেখানে রোঁমা রোলাঁ থাকেন। রোলাঁই কবিকে ফাসিস্ত ইতালির সত্যকার রূপটি জানিয়ে দিলেন। বহু উদ্বাস্তুর সঙ্গে দেখা হলো—যারা মুসোলিনীর উপদ্রবে সমস্ত হারিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি—মুসোলিনীর আদর আপ্যায়ন পেয়ে আকৃষ্ট হতেও বেশি সময় লাগে নি—তা থেকে মুক্ত হতেও অধিক সময় লাগলো না। মুসোলিনীর আতিথ্য গ্রহণ করাটাই যে ভুল হয়েছিল—তা বুঝা মাত্রই তিনি সাময়িক পত্রে তা জ্ঞাপন করেছিলেন, তবে তা ভালভাবে বুঝতে সময় লেগেছিল।

সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, ডেনমার্কে এলেন। উত্তর য়ুরোপ সফর শেষে বাল্টিক সাগর পার হচ্ছেন—এমন সময়ে কোথা থেকে 'বৈকালী' গীতগুচ্ছের সুরটি ফিরে পেলেন—

সে কোন পাগল যায় পথে তোর
যায় চলে ওই একলা রাতে—
তারে ডাকিসনে তোর আঙিনাতে—

বার্লিন, ম্যুনিক, নুরেনবার্গ, স্টুটগার্ট, কল্যোন, ড্যুসেলডর্ফ বক্তৃতা করে ঘুরছেন—কিন্তু এরই মাঝে প্রতিদিনই প্রায় গান লিখছেন।

জারমেনী থেকে চেকোস্লোভাকিয়া হয়ে যখন হাঙ্গেরির বুডাপেষ্টে এলেন, তখন শরীর পড়লো ভেঙে। এ বয়সে এতো ঘোরাঘুরি সইবে কেন? ডাক্তারের পরামর্শে বাধ্য হলেন বিশ্রাম করতে—তাই হাঙ্গেরির বিখ্যাত বাতালন ফুরাদ নামে হ্রদের ধারে আশ্রয় নিলেন। এখানে 'লেখন' বইটি নূতন পদ্ধতিতে ছাপবার জন্য স্বহস্তে লিখে দিলেন।

এই হ্রদের ধারে কবির হাতে-পোঁতা একটি গাছ আছে। তার পাশে বাংলা চার পংক্তি কবিতা ও তার ইংরেজি অনুবাদ আছে খোদাই করা—

হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে
তখন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে
তোমার মর্মরধ্বনি পথিকেরে কবে
'ভালো বেসেছিল কবি বেঁচে ছিল যবে'।

হাঙ্গেরির বিশ্রাম পর্ব শেষ করে আবার ভ্রমণ শুরু হলো—যুগোস্লাবিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া। কৃষ্ণ সাগরের বন্দরে জাহাজ ধরে দার্দানালিসের মধ্যে দিয়ে এসে ইস্তাম্বুলে আর নামলেন না; পিহ্‌রাস বন্দরে নেমে আথেন্সের উপর চোখ বুলিয়ে এলেন। তারই মধ্যে গ্রীক্ সাহিত্যিকরা এসে কবি-সম্বর্ধনা করে গেলেন, আর গ্রীক্ সরকার তাঁদের শ্রেষ্ঠ সম্মানে কবিকে ভূষিত করে গেলেন।

এই আথেন্স থেকে তাঁর য়ুরোপ সফরের নিত্যসঙ্গী—প্রশান্তচন্দ্র

মহলানবিশ ও তাঁর পত্নী নির্মলকুমারী দেবী কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইংল্যণ্ডে ফিরে গেলেন।

এবার মিশর পড়লো পথে। আলেকজন্দ্রিয়াতে নামলেন। আতিথেয়তা করলেন এক ধনী ইতালীয় ব্যাংকার। "আমাকে যে বাগানবাড়িতে রেখেছিলেন সে অতি সুন্দর।....একদিকে বাগান, আর একদিকে নীল সমুদ্র,....সমস্ত দিন নিস্তব্ধ নির্জন।"

"পরদিন কায়রোর পালা।....বৈকালেতে সেখানকার সর্বোত্তম আরবী কবির বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ।....সেখানে ইজিপ্টের সমস্ত রাষ্ট্রনায়কের দল উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটার সময় পার্লামেণ্ট বসবার সময়। আমার খাতিরে একঘণ্টা সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল।....ওখানে ক্বানুন ও বেহালা যন্ত্রযোগে আরবী গান শোনা গেল—বোঝা গেল ভারতের সঙ্গে আরব-পারস্যের রাগরাগিণীর লেনদেন এক সময়ে খুবই চলেছিল।" মিশরের রাজা ফুয়াদের সঙ্গে দেখা হলো। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ভারতের পক্ষ থেকে কোনো ভারতীয় এদেশে এমনভাবে সম্মান লাভ করেনি।

মিশর থেকে ভারতে ফিরলেন পৌষ উৎসবের মুখে (১৯২৬, ১৮ ডিসেম্বর)।

দেশে শান্তি নেই—হিন্দু-মুসলমানের খিলাফতী প্রেমের রাখি ছিঁড়ে গেছে। অপর দিকে ইংরেজের কঠোর হস্ত দেশপ্রেমিকদের পিষে মারছে। এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ একখানা চিঠি লিখলেন—

"আইনে সংক্ষিপ্ত পথ অবলম্বন করার অর্থ প্রায় তেমনি মারাত্মক যেমন মারাত্মক একটি শূয়োরের ভাজা মাংস খাবার জন্য সারা ঘরে আগুন লাগানো।—এ হল যথেচ্ছাচারের আদিম রূপ। আমরা প্রতিশোধ নেবার দাবি জানিয়ে শাসকবর্গের কাছে হাস্যাস্পদ হই। মনুষ্যত্বের দাবিই আমরা জানাতে পারি। সে দাবি যে অগ্রাহ্য করে—গোপন আঘাত তার উপর এসে পড়ে।"

কবির মনে হচ্ছে এই উদ্‌ভ্রান্ত জনতা ও উৎপীড়ক শাসক—এদের সম্মুখে মহাকারুনিক ভগবান বুদ্ধের মহামৈত্রের বাণী এনে ধরতে হবে। তাই কলকাতায় তাঁদের বাড়িতে 'নটীর পূজা' অভিনয় করালেন। কবি উপালির ভূমিকায় নামলেন।

ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপ-দহন দীপ্ত
বিষয়-বিষ-বিকার জীর্ণ ক্ষিণ্ন অপরিতৃপ্ত
শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাধন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।

অভিনয়-কলার দিক থেকে 'নটীর পূজা' স্মরণীয়। এই নাটিকায় নটীর ভূমিকায় নামলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর বালিকা কন্যা গৌরী দেবী। তাঁর ভক্তিপ্লুত সহজ নৃত্য সকলকে মুগ্ধ করলো। এই প্রথম, যখন ভদ্রঘরের কন্যা সাধারণের সম্মুখে নৃত্যে নামলো। যুগান্তর আনলো এই ছোট্ট ঘটনাটি। বাঙালী মেয়েদের পায়ের শৃঙ্খল সরিয়ে পরিয়ে দিল নূপুর—সমাজে সেদিন থেকে নৃত্য স্বীকৃত হলো।

'নটীর পূজা' থেকে কবির মন কখন যেন নটরাজের ধ্যানে ও গানের অতল রসের মধ্যে চলে গেল! ঋতুরঙ্গশালার নট-নটী হচ্ছে তরুলতার দল। বৃক্ষবন্দনায় তার আরম্ভ, বসন্তোৎসবের সমারোহে তার পূর্ণ পরিণতি। নটরাজের কল্পনায় এলো বিশ্বাত্মাবোধ। "নটরাজের তাণ্ডব তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশের রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে-বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগত ও জীবনে অনন্ত লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়। নটরাজ পালাগানের এই মর্ম।"

পালাগান লিখুন, চরকা-খদ্দর নিয়ে আলোচনাই করুন—সংসার ও বিশ্বভারতীর চাহিদা রাত পোহালে তাঁহাকে মেটাতে হয়। দারুণ অর্থাভাব সংসারে, জমিদারীতে অজন্মা ; বিশ্বভারতীরও দশা তদ্রূপ।

ভরতপুরে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন—রবীন্দ্রনাথকে মহারাজার এক সচিব এসে ধরলেন—সেখানে যেতে হবে। আশ্বাস পেলেন বিশ্বভারতীর জন্য হয়তো কিছু দান পাওয়া যেতে পারে। চৈত্র মাসের দারুণ গরমে চললেন। আতিথ্য আপ্যায়ন যথেষ্ট হলো—চারদিকের অযথা অপব্যয় দেখলেন। কিন্তু দেওয়ান জানালেন রাজকোষে দৈন্য—শূন্য হাতে ফিরলেন।

ফিরে এসে বর্ষশেষের দিন লিখলেন—

'যাত্রা হয়ে আসে সারা, আয়ুর পশ্চিম পথশেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।....
আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।....
লভিয়াছি জীবলোকে মানব জন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে অমৃত ধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি। (পরিশেষ)

গ্রীষ্মকালে গেছেন শিলঙ পাহাড়—নিরালায় আছেন। লিখছেন কবিতা আর শুরু করলেন এক উপন্যাস—যার নাম হয় পরে 'যোগাযোগ'। "বিচিত্রা নাম দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ চলছে—আমি তাঁদের ফাঁদে কতকটা ধরা দিয়েছি, অভাবের দায়ে ....।" যোগাযোগ উপন্যাস 'বিচিত্রা' নিল—মাসে মাসে লিখে চললেন।

এমন সময় মন ছুটলো বৃহত্তর ভারতকে দেখবার জন্য। প্রাচীন-কালের হিন্দু বৌদ্ধ যুগের অনেক স্থাপত্যকীর্তি আছে দ্বীপময় ভারতে। "সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং

এ সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নাই।....কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি এবং এও জানি আমার দ্বারা কাজটা সহজসাধ্য হতেও পারে, জাভা গবর্ণমেণ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নি।....”

কবির সঙ্গে চলেছেন সুনীতি কুমার চাটুজ্জে ও সুরেন্দ্রনাথ কর। কবির আগে গেছেন পথিকৃৎরূপে মালয়দ্বীপে আর্যনায়কম, জাভায় গেছেন ওলন্দাজ বাকে দম্পতি।

মালয় উপদ্বীপে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের আশায় উপদ্বীপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যাচ্ছেন—কখনো ট্রেনে, কখনো স্টীমারে, কখনো মোটরে। সিঙ্গাপুর হয়ে মালাক্কা, মুয়ার, কুয়ালালুমপুর, পেরেম্বান, ইপোঃ, তেলোক-আনসন, তাইপিঙ, পিনাঙ।....

“ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। দিনের মধ্যে দু'তিন রকমের প্রোগ্রাম। নতুন নতুন জায়গায় নিমন্ত্রণ।....চলেছি উজান বেয়ে, গুণ টেনে, দাঁড় বেয়ে পদে পদে জিব বেরিয়ে পড়ছে।....পথ সুদীর্ঘ, পাথেয় স্বল্প ; অর্জন করতে করতে, গর্জন করতে করতে, হোটেলে হোটেলে ডলার বর্জন করতে করতে আমার ভ্রমণ—গলা চালিয়ে আমার পা চালানো।”

মালয় উপদ্বীপ সফর শেষ করে, ঘুরলেন বালি দ্বীপ, জাভা দ্বীপ। দেখলেন বালি দ্বীপের হিন্দুদের শেষ দশা, দেখলেন জাভা দ্বীপের স্থাপত্যশোভা। বরবুদুর দেখে লিখলেন—

অর্থ আজ হারায়েছে সেযুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতি কুহেলিকা।
অর্থশূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণ বিলাসী—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি।

দ্বীপময় ভারত ভ্রমণ শেষে সিয়াম বা থাইভূম ঘুরে এলেন। এশিয়ার তখনকার একমাত্র স্বাধীন বৌদ্ধরাজ্য থেকে রবীন্দ্রনাথ রাজপরিবার ও সাধারণ জনতার কাছ থেকে রাজসম্মান পেলেন। এমন অনাকাঙ্ক্ষিত অকথিত সম্বর্ধনা কোনো ভারতীয়ের ভাগ্যে হয়নি।

দেশে ফিরলেন (১৯২৭ অক্টোবর)। এসেই জড়িয়ে পড়লেন সাহিত্যের রুচি ও নীতি নিয়ে বিতর্কের মধ্যে ; কিন্তু বের হয়ে আসতেও সময় লাগলো না। "রাজধানীর জনসংঘের কোলাহল থেকে....আজ (শান্তিনিকেতনে) এসে বর্ষশেষের যে রূপটি এখানে দেখলুম, রাজধানীতে থাকলে সেটি এমন প্রত্যক্ষ করে দেখতে পেতুম না—সেখানে একটি ঘূর্ণিপাকের আচ্ছাদন চারিদিকে।"

বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি,
আয়রে ফিরে আয়।
পুরানো ঘরে দুয়ার দিয়া ছেঁড়া আসন মেলি,
বসিবি নিরালায়।

মন ডুবেছে সুরের মধ্যে। 'নটরাজ ঋতু রঙ্গশালার নূতন রূপ দিলেন 'ঋতুরঙ্গ' নামে—নৃত্য নূতন রূপ পেলো এবার।

"ঋতুরঙ্গের কিছু পূর্বে গুরুদেব জাভা যাত্রা করেছিলেন। জাভানী নৃত্যের নানাবিধ ছবি এবং নৃত্য-সাহিত্য তাঁর সঙ্গে দেশে এসেছিল ; আর এসেছিল সেখানকার কথা-নৈপুণ্যের প্রযোজনা। এই সূত্রে আমাদের ছেলে-মেয়েদের জাভানী নৃত্য-পদ্ধতি আয়ত্ত করবার সুযোগ হয়েছিল। সেইজন্য ঋতুরঙ্গের নাট্যসজ্জার মধ্যে জাভানী আভাস বর্তমান ছিল।...." (প্রতিমা দেবী : নৃত্য)

আর বালিদ্বীপ থেকে আসলো নৃত্যশীলা বালিকাদের শোভাযাত্রা —যা বৃক্ষরোপণ উৎসবে প্রবর্তন করেন। আজ তা সর্বত্র বন-

মহোৎসবের দিন দেখা যায় ; তাঁর শান্তিনিকেতনেই, সে-কথা আজ ক'জনের জানা।

১৯২৮ সাল। বিলাত যাবার আহ্বান এসেছে—অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতা দেবার জন্য। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম ভারতীয় আহূত হলো বক্তৃতার জন্য। যাত্রা করলেন মাদ্রাজের পথে—কলোম্বোতে গিয়ে স্টীমার ধরবেন। কিন্তু পথে শরীর গেল বিগড়িয়ে—বিশ্রাম করতে বাধ্য হলেন মাদ্রাজে তারপর কলোম্বো চলেছেন স্টীমারে। পথে পড়লো পণ্ডিচেরী, নামলেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগলো। "প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম, ইনি আত্মাকেই সব চেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন।....আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরের আলো জ্বালবেন।....অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম—সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়, আজও মনে মনে বলে এলুম তাঁকে, 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'।"

কলোম্বো পৌঁছলেন কিন্তু শরীরের কোন উন্নতি নেই। তাই সেযাত্রা বিলাত যাত্রা স্থগিত করতে হলো। ভারতে ফিরে এলেন। বিশ্রামের জন্য আশ্রয় নিলেন বঙ্গলুরে—ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাড়িতে। তিনি তখন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এখানে শরীর একটু ভালো বোধ করতেই লিখলেন 'শেষের কবিতা' উপন্যাস। তখন 'যোগাযোগ' শেষ হয়নি। সুতরাং দুটোই চলেছে প্রায় একই কালে। 'শেষের কবিতা' রচনা কালে সত্যিই কবিতাও এসেছে অনেকগুলি। সেগুলি 'মহুয়া' কাব্যখণ্ডের অগ্রদূত।

'যোগাযোগে' দেখলাম প্রেমের দ্বন্দ্ব, 'শেষের কবিতায়' প্রেমের মিলন ; 'মহুয়া'য় পাচ্ছি বিশুদ্ধ নৈর্ব্যক্তিক প্রেমের প্রশস্তি গান।

দক্ষিণ ভারত থেকে খুব ক্লান্ত দেহ মন নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন। ইচ্ছা করছে গান করতে বা সৃষ্টিছাড়া ছবি আঁকতে; কিন্তু "ক্লান্তি-ভরা কুঁড়েমির ডিগ্রিটা এতটুকু কাজ করারও নিচে।"

সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল যেমন বর্ষামঙ্গলের সঙ্গে 'বৃক্ষরোপণ' উৎসব করার পরিকল্পনার উদয় হলো। আজ যে ভারতব্যাপী বন-মহোৎসব হচ্ছে প্রতি বৎসর বর্ষার আবির্ভাবে—তার উৎপত্তি হলো রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ উৎসব থেকে (১৯২৮, জুলাই ১৪)।

বৃক্ষরোপণ হলো শান্তিনিকেতনে—আর তারপর দিন শ্রীনিকেতনে হলো হলকর্ষণ বা সীতা-যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

শরৎকালটা কাটালেন কলকাতায় কখনো জোড়াসাঁকোর বাড়িতে, কখনো আর্ট স্কুলের বাড়িতে। মহুয়ার বেশির ভাগ কবিতা এখানে লেখা। সাতষট্টি বৎসর বয়সে প্রেমের কবিতা লিখলেন—ভাবলেও অবাক লাগে। কিন্তু এ কবিতা ও 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র প্রেমের কবিতা একজাতের নয়, তাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য।

শুধায়োনা, কবে কোন গান,
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার 'পরে পড়ে আছে তারি তরে
যে তাহারে দিতে পারে মান।
তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি'?
জানিনা তোমার নাম, তোমারেই সঁপিলাম
আমার ধ্যানের ধনখানি॥

"যাকে তোমরা ভালোবাসা বলো, সেরকম ক'রে আমি কাউকে কোনোদিন ভালোবাসিনি।....ভিতরে একটা জায়গায় আমি নির্মম, তাই আজ যে জায়গায় এসেছি সেখানে আসা আমার সম্ভব হয়েছে।

আর তা যদি না হত, যদি জড়িয়ে পড়তুম, তাহলে আমার সব নষ্ট হয়ে যেত। কোনো বন্ধনই আমায় শিকল হয়ে বাঁধেনি কোনোদিন।"

এক জায়গায় বসে থাকা স্বভাবেও নেই, ভাগ্যেও নেই। তিনটে মাস এক সঙ্গে একটা জায়গায় কখনো থেকেছেন কিনা সন্দেহ। এই অফুরন্ত চলার মধ্যে শান্তম্ শিবদ্বৈতম্ অন্তরে স্তব্ধ হয়ে আছেন বলেই তাঁর পক্ষে এই বিরাট ও বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

ডাক এলো কানাডা ডোমিনিয়নের শিক্ষা পরিষদ থেকে। শিক্ষার সঙ্গে অবসরের কী সম্বন্ধ সেটাই ছিল কবির ভাষণের বিষয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের পথে যেতে হলো, কারণ সম্মেলন বসেছে ভ্যাংকুভারে। কানাডায় দশদিন মাত্র ছিলেন—পূর্বদিকে আর যাওয়া হয়নি।

ফেরবার সময়ে জাপানে একমাস কাটিয়ে এলেন। তারপর ফরাসী ইন্দোচীন হয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন।

এবার জাপান থেকে একজন জুজুৎসু ব্যায়াম-বীর ভারতে আনবার জন্য ব্যবস্থা করে আসেন; তাকাগাকি সান্ শান্তিনিকেতনে দুটো বছর ছিলেন। বেশ কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল—কিন্তু তিনি শিষ্য বা উত্তরসূরী তৈরি করে যেতে পারেন নি বলে বিশ্বভারতী বা বাংলাদেশ কোনোভাবেই লাভবান হলো না। কবির আন্তরিক ইচ্ছা ছিল জুজুৎসু বিদ্যা দেশের মেয়েরা শিখে নিক—দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার এমন হাতিয়ারশূন্য অস্ত্র আর নেই। দেশবাসী কবির ইচ্ছায় সায় দেয়নি।

দেশে ফিরে কিছুকালের মধ্যে জানতে পারলেন—অবনীন্দ্রনাথেদের বাড়ির ছেলেয়-বুড়োয় মিলে 'রাজা ও রানী'র অভিনয় করবে। কবি নাটকটাকে রূপান্তরিত করে লিখলেন 'তপতী' নাম দিয়ে গদ্য নাটক।

গদ্যে নাটকটা কেন লিখলেন—তার কৈফিয়ত দিয়েছেন এক পত্রে। 'নেড়া ছন্দে ব্ল্যাঙ্কভার্সে' লেখা থেকে গদ্যে তার থেকে ঢের বেশি জোর পাওয়া যায়।....গদ্য রচনায় আত্মশক্তির বা আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। হয়তো ভাবীকালে সঙ্গীতটাও বন্ধনহীন গদ্যের গূঢ়তর বন্ধনকে আশ্রয় করবে—কখনো কখনো পদ্য রচনায় সুর সংযোগ করার ইচ্ছা হয়।"

সে ইচ্ছা যে পূরণ করেন নি—তা নয়। বহু গদ্য ছন্দের কবিতা 'গান' রূপেই পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের শেষ য়ুরোমেরিকার সফর এলো (১৯৩০ মার্চ, ডিসেম্বর)। হিবার্ট লেকচার দেবার জন্য চললেন ইংলণ্ড। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল—গত কয়েক বৎসর থেকে তিনি লেখনীর সঙ্গে তুলিকা অবাধে ব্যবহার করে বহু শত ছবি এঁকেছেন। তাঁর ইচ্ছা য়ুরোপে সে-সবের প্রদর্শনী করেন। সে সব ছবি যে কোনো বিশেষ পদ্ধতিতে আঁকা তা নয়। "আমাদের দেশের সঙ্গে আমার চিত্র-ভারতীর সম্বন্ধ নেই বলে মনে হয়। কবিতা যখন লিখি তখন বাংলার বাণীর সঙ্গে তার ভাবের যোগ আপনি জেগে ওঠে। ছবি যখন আঁকি তখন রেখা বলো, রং বলো কোনো বিশেষ প্রদেশের পরিচয় নিয়ে আসে না।....এই ছবিগুলিকে পশ্চিমের হাতে দান করছি।"

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটনলেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি....
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে
অব্যক্ত আছিলি যবে........

বিশ্বের বিচিত্ররূপ চলেছিল নানা কলরবে
নানা ছন্দে লয়ে সৃজন প্রলয়ে।
অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন গুণী
নিঃশব্দে ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়। (পরিশেষ)

য়ুরোপে পৌঁছলেন। প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হলো প্যারিসে। "ঘর পেলেই ছবির প্রদর্শনী আপনিই ঘটে" না। কঁতেসদ নো আই ও আঁদ্রের অক্লান্ত পরিশ্রম আর ভিকটোরিয়া ওকাম্পোর অকাতরে অর্থব্যয়ের ফলেই প্রদর্শনী সফল হলো।

ইংলণ্ডে পৌঁছিয়ে হিবার্ট বক্তৃতাগুলি দিলেন অক্সফোর্ডে। ভাষণের বিষয় ছিল 'দি রিলিজিয়ান অব্ ম্যান'—'মানুষের ধর্ম' নামে। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার মর্মকথা ব্যাখ্যা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার পর এক পত্রিকা লিখলেন—

"হিবার্ট বক্তৃতামালায় পূর্বে জনসাধারণের এরূপ আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা যায় নাই, যেমন এবারে দেখা গেছে।"

কবি যখন ইংলণ্ডে, তখন আইন অমান্য আন্দোলন চলছে ভারতে। কংগ্রেসের সকলেই একে একে জেলে গিয়েছেন। ব্রিটিশের অত্যাচার চলছে নানাভাবে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হলো ঢাকায়—চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করলো—শোলাপুরে সরকার 'মার্শাল ল' জারি করেছেন—গান্ধী টুপি মাথায় দিলেই শাস্তি। রবীন্দ্রনাথ তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে লিখলেন ইংরেজদের ; বললেন, কেবলমাত্র "ভীতিপ্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ দ্বারা এই জটিলতার অবসান ঘটান কোনমতেই সম্ভব নয়।"

তিনি বললেন পূর্ব ও পশ্চিমের মনীষীদের মিলন প্রয়োজন—তবেই পূর্ব ও পশ্চিমে বোঝাপড়া সম্ভব হবে।

ইংল্যণ্ড থেকে মধ্যয়ুরোপ সফরে চললেন। জারমেনীতে এসে

বার্লিনে চিত্র প্রদর্শনী হলো—লোকে বিস্ময় দৃষ্টিতে দেখে। কবির তৃপ্তি হলো—আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করে এসে।

১৯২১ ও ১৯২৬ সালের জারমেনী আর ১৯৩০ সালের জারমেনীর অনেক তফাৎ। বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছেন কালবদলের হাওয়া দিয়েছে। "য়ুরোপের অন্য সকল জাতের হাতের ঠেলা খেয়ে এরা ভিতরে ভিতরে খুব কঠোরভাবেই ন্যাশনালিস্ট হয়ে উঠছে।.... দারিদ্র্যের ঠেলা খেয়েই এদের শক্তি আরো যেন দুর্দম হয়ে উঠেছে।"

বার্লিন থেকে ড্রেসডেন হয়ে ম্যুনিক এলেন। ম্যুনিকের কিছু দূরে মধ্যয়ুরোপের বিখ্যাত প্যাশান প্লে বা যীশুখৃষ্টের শেষ জীবনাংশের অভিনয় হয়, দশ বৎসর অন্তর। বহু লোক আসে দেশ-বিদেশ থেকে। কবি সারাদিন বসে দেখলেন। মনে গভীর রেখাপাত করলো সে অভিনয়। তারপর 'দি চাইল্ড' নামে যে কথিকাটি লিখলেন, তার পটভূমে আছে যীশুর জীবনকথা। এটি কবির একমাত্র বই যা ইংরাজিতেই লেখা।

জারমেনী সফর শেষ হলো। অমিয় চক্রবর্তী লিখছেন—"সম্রাটের মতো জারমেনী পরিক্রমণ করছি—শ্রেষ্ঠ যা কিছু আপনিই আমাদের কাছে এসে পড়চে—যেখানে যা কিছু সুন্দর, স্মরণীয়। এদেশের মনীষী যাঁরা ভাবছেন, আঁকচেন, লিখচেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সহজে সকলের পরিচয় ঘটেচে, আমরাও ভাগ পাচ্ছি।...."

জারমেনী থেকে ডেনমার্ক ঘুরে এলেন সুইস দেশের জেনিভা শহরে। 'লীগ্ অব্ নেশন্সে'র বিরাট দপ্তর সেখানে—কবির মনে হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানে ঠিক সুর বাজেনি এবং তাঁর আশঙ্কা হয়তো বাজবেও না।

•

জেনিভায় ঠিক করলেন এবার সোবিয়েত রাশিয়া সফরে যাবেনই —পূর্বে কয়েকবারই নানাভাবে বাধা পেয়েছিলেন। তবে এবারেও

জেনিভাতে তাঁর চারিদিকে সেসময় যে সকল ইংরাজ ছিলেন তারা ক্রমাগত তাঁকে তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে এই যাত্রা করিতে নিষেধ করেন।

মসকো পৌঁছলেন ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩০। "রাশিয়ায় অবশেষে আসা গেল। যা দেখছি আশ্চর্য ঠেকছে। অন্য কোনো দেশের মত নয়। একেবারে মূলে প্রভেদ। আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা জাগিয়ে তুলেছে। চিরকাল মানুষের সভ্যতায় একদল অজ্ঞাত লোক থাকে....তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি ঝাঁটা খায়।...."

"এখানে এসে যেটা সবচেয়ে আমার চোখে ভালো লেগেছে সে হচ্ছে এই ধন-গরিমার ইতরতার সম্পূর্ণ তিরোভাব।.... কেবলমাত্র এই কারণে এদেশে জনসাধারণের আত্মমর্যাদা এক মুহূর্তে অবারিত হয়েছে।"

পনরো দিন ছিলেন—যা দেখানো হলো দেখলেন, যা শোনানো হলো শুনলেন, যা পড়তে পেলেন, পড়লেন। "আজ পৃথিবীতে অন্ততঃ এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যা।"....

সোবিয়েত রুশ থেকে মার্কিনী মুলুকে—মেরু থেকে মরুভূমের ব্যবধান। নিউ ইয়র্কে এসেছেন—কোনো আহ্বান নেই। ভারতীয়রা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন চালাচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ সে সব কথা নিয়ে যদি আলোচনা করেন, তবেই তো মুশকিল— ইংল্যাণ্ডে তো অনেক কথাই বলেছেন। তারপর সদ্য সোবিয়েত রাশিয়া থেকে আসছেন—যদি সে দেশের জয়গান করেন! তাই সভাসমিতি নয়, খুব ধুমধাম করে ভোজ দেওয়া হলো সব থেকে বড় হোটেলে। "নিমন্ত্রিতের তালিকাটিতে কারবারী ও ধনীলোকের নাম অনেক।.... কিন্তু একজন কবির নাম তো পেলাম না—এমন কি একজন লেখকের

নামও না। এমন ব্যাপার কি ফ্রান্সে হতে পরতো ?” এটি লেখেন স্যাটার্ডে রিভিউ পত্রিকা।

আমেরিকা থেকে (২৩ ডিসেম্বর ১৯৩০) লণ্ডনে ফিরলেন। তখন সেখানে ভারতের নূতন পরিকল্পিত সংবিধানের জট খোলবার চেষ্টায় প্রথম গোলটেবিল বৈঠক বসেছে। ভারত থেকে রাজা, মন্ত্রী, নবাব, উজীর, মুসলীম লীগ ও হিন্দু মহাসভা, শিখ ও সিডিউল—সবাই নিজ নিজ ফিরিস্তি নিয়ে হাজির, নিজের কোলে ঝোল টানবার জন্য সকলেরই জিদ। কেবল আসেনি কংগ্রেসের কেউ—তারা সব জেলে আটক। রবীন্দ্রনাথ দেশের সার্বিক কল্যাণের কথা দু'চার জনের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বুঝলেন যে তাদের কাছে দেশ থেকে দল বড়ো। হিন্দু-মুসলমানের মতের মিল নেই—মিলনের সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রায় এক বৎসর য়ুরোমেরিকা সফর করে কবি দেশে ফিরলেন (১৯৩১ জানুয়ারী ৩১)।

দিন যায়—কবিতা লিখে, ছবি এঁকে, জলসা করে, বিশ্বভারতীর ছোট বড় কাজ, বাজে কাজ ও অকাজ দেখে। সত্তর বৎসরে জন্ম দিন এলো শান্তিনিকেতনে। সেদিন বললেন—“একটি মাত্র পরিচয় আমার আছে সে আর কিছু নয়—আমি কবি মাত্র। আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী পুরুষ বা নেতা নই—আমি বিচিত্রের দূত।” আমি নানা কিছুতেই মিলে আছি·· আমি স্বভাবতঃই সর্বাস্তিবাদী—অর্থাৎ আমাকে ডাকে সকলে মিলে, আমি সমগ্রকে মানি।”····কখনো শান্তিনিকেতনে, কখনো বরাহনগরে, কখনো বা দার্জিলিংয়ে থাকেন।

একবার গেলেন ভূপাল দরবারে—ভাবলেন নবাব বাহাদুর হায়দ্রবাদের নিজাম বাহাদুরের দৃষ্টান্তে উদার হস্তে বিশ্বভারতীতে অর্থ দান করবেন।

“ভূপাল থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছি। রাজপ্রাসাদে দুটো দিন ছিলুম। আরও দুই এক জায়গায় যাবার সংকল্প ছিল।

আমার ও তাঁদের সৌভাগ্যক্রমে যাঁদের লক্ষ্য করে যাওয়া, তাঁরা কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সেটা উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ক্ষতিকর, কিন্তু মনের পক্ষে অনুকূল।" শূন্য হাতে ফিরলেন যেমন ফিরেছিলেন ভরতপুর থেকে।

১৯৩১ সালের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হলো; সাত দিন ব্যাপী উৎসবের শেষ দিকে খবর এলো—গান্ধীজিকে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক থেকে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যে গ্রেপ্তার করে পুণার য়েরবাদা জেলে পাঠানো হয়েছে। উৎসবের অন্তর্গত মেলা বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ভারতের বাইরের শেষ আহ্বান এলো এশিয়ার নব জাগ্রত ইরান থেকে—রেজাশাহ পেহ্লবী শাহনশাহর আমন্ত্রণ। কলকাতা থেকে উড়ো জাহাজে করে পৌঁছলেন বুশায়ার। সেখান থেকে শুরু হলো মোটর পথে যাত্রা রাজধানী তেহারানের দিকে। দূরত্ব যত না বেশি, পথ দুর্গম বলে তা খুবই দীর্ঘ লাগছে। শিরাজ, ইসপাহান এবং আরও ছোট ছোট স্থানে থামতে থামতে চলেছেন।

দিন পনরো তেহারানে কাটে—বাদশাহী সমাদরে আছেন। শাহনশাহর সঙ্গে দেখা হলে কবি তাঁকে এই কবিতাটি উপহার দিলেন

আমার হৃদয়ে অতীত স্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে,
মরিচা-ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।

তোমরা জ্বেলেছ নূতন কালের উদার প্রাণের আলো,
এসেচি, হে ভাই, আমার প্রদীপে তোমার শিখাটি জ্বালো।

কবির জন্মদিন শাহনশাহর আদেশে রাজকীয় ভাবে উদ্‌যাপিত হলো।

ইরানের পাশেই ইরাক—আরবদের রাজ্য নূতন গড়েছে। রাজা ফৈজলের নিমন্ত্রণ পেয়ে বোগদাদ গেলেন। টাইগ্রিস নদীর ধারে একটি

হোটেলে তাঁদের জায়গা হয়েছে। ঘরের সামনে মস্ত ছাদ, সেখানে বসে নদী দেখা যায়। টাইগ্রিস প্রায় গঙ্গার মতোই প্রশস্ত। ফৈজলের সাদাসিদে অনাড়ম্বর ব্যবহার, কবিকে খুবই ভালো লাগে। কবির সাধ বেদুইনদের দেখেন। একদা লিখেছিলেন—

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন....

রাজা তার ব্যবস্থা করেছিলেন। কবি বেদুইনদের তাঁবুতে গেলেন ; তাদের সঙ্গে ভোজ খেলেন, তারপর তাদের লোকনৃত্য দেখলেন। একটা জীবনে কত অভিজ্ঞতাই হয়েছে।

প্রাচ্যের দুইটি মুসলমান রাজ্য দেখা হলো। এর পূর্বে মিশর দেখেছেন। জাভা সুমাত্রার মুসলীম দেশে গেছেন।

দেশে ফিরে আছেন বরাহনগরে প্রশান্ত চন্দ্রদের বাসায়। আপন মনে কবিতা লিখছেন, তারও মধ্যে নূতনত্বের পরীক্ষা চলছে গদ্য ছন্দে কবিতা লেখার।

'পরিশেষ' কাব্য লিখে ভেবেছিলেন—সেই তাঁর শেষ কবিতাগুচ্ছ। কিন্তু দেখলেন—আবার কোথা থেকে ধারায় তারা আসছে। লিখলেন 'পুনশ্চ।' তারপর বীথিকার ছন্দ-মিলের কবিতা লিখলেন।

এমন সময়ে ভাবের সূত্রটি ছিঁড়ে গেলো—য়েরবাদা জেলে গান্ধীজির অনশনের সংবাদ এলো। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী রচিত নয়া সংবিধানের খসড়ায় হিন্দু জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করবার জন্য সুপারিশ করেছেন—তার বিরুদ্ধে এই অনশন ব্রত গ্রহণ।

রবীন্দ্রনাথ পুণায় চলে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যায় প্রধান মন্ত্রীর আপোষী সংবাদ এলো—গান্ধীজি অনশন ভাঙলেন। কবি গান্ধীজির প্রিয় গানটি গাইলেন—

জীবন যখন সুখায়ে যায় করুণা ধারায় এসো।

এই ঘটনার পর রাজনীতিকদের চেতনা হলো—'হরিজন' আন্দোলন শুরু হলো সেদিন থেকে।

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও না-কি
নেমেছে ধূলার তলে হীন-পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে তাদের সবার সমান।

এইটি কবি বলেছিলেন বহু বৎসর পূর্বে—তখন কারও দৃষ্টি যায়নি হীন-পতিতের দিকে।

পুণা থেকে ফিরছেন। লিখলেন 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা' নাটক দুটো। অভিনয় হলো কলকাতায়—বিশ্বভারতীর জন্য অর্থের প্রয়োজন। তারপর চললেন বোম্বাই, ওয়ালটেয়ার, হায়দরাবাদ বক্তৃতা করতে।

কলকাতায় থাকুন আর শান্তিনিকেতনেই থাকুন, নানা কাজের জন্য তাগিদ আসে। পুত্র-কন্যার নামকরণ, বিবাহের আশীর্বাদ, পুস্তকের সমালোচনা, নূতন পত্রিকার জন্য বাণী। কলকাতায় থাকলে কারও দোকান খুলতে হবে, কাপড়ের কল চালাতে হবে, কলমের কারখানা খুলতে হবে—রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি চাই। এ ছাড়া সভাসমিতি তো আছেই। এসব ক্লান্তিকর কাজ করতেন বিশ্বভারতীর মুখ চেয়ে—ধনীরা যদি কিছু দয়া করে দান করেন।

তিয়াত্তর বৎসর বয়সে অভিনয়ের দল নিয়ে গেলেন সিংহল। খুব ঘুরলেন—তার মধ্যে লিখছেন 'অন্ত এলার কাহিনী', 'চার অধ্যায়' উপন্যাস (১৯৩৪ জুন)। ঘোরার শেষ নেই—এ বয়সে কোথায় মাদ্রাজ, আবার কোথায় কাশী।

শ্রান্তিতে, জরাতে ব্যাধিতে দেহ জীর্ণ—তবু বিশ্রাম নেই, বিরাম নেই—অর্থের সন্ধানে বের হতেই হবে। অভিনয়ের দল নিয়ে উত্তরভারত পরিক্রমায় চললেন—শহর থেকে শহরে। দিল্লী পৌঁছলেন। গান্ধীজি সেইদিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন ; বললেন, এ বয়সে এভাবে ভ্রমণ করা চলতে পারে না—বিশ্বভারতীর ঘাটতির ব্যবস্থা তিনি করে

দেবেন। কবির হাতে একটা মোটা অঙ্কের চেক্ যোগাড় করে পাঠিয়ে দিলেন। কবি নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশি বৎসর পূর্ণ হলে (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ সমাবর্তনে ভাষণ দেবার জন্য আহূত হলেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো বে-সরকারী ব্যক্তি কনভোকেশনের ভাষণ দিলেন। আর রবীন্দ্রনাথও সর্বপ্রথম তাঁর ভাষণ বাংলা ভাষায় দিলেন—এ পর্যন্ত যা কেউ করেনি। "ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।"

শরীর দুর্বল হচ্ছে। মাঝে তো একবার খুব ফাঁড়া কেটে গেল। তাই আলমোড়ায় গেলেন—বিশ্রামের জন্য। এই আলমোড়া ১৯০৩ সালে গিয়েছিলেন রুগ্ন কন্যাকে নিয়ে। সেবার লিখেছিলেন 'শিশু'র কবিতা—এবার লিখছেন 'ছড়ার ছবি'। সেই শিশু মনেরই ডাক। কিন্তু তার থেকে গম্ভীর কাজ হলো 'বিশ্ব পরিচয়' লেখা। এই বইটা লেখার জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক বই পড়েন, কঠিন তত্ত্ব না বুঝতে পারলে অধ্যাপকদের ধরে বুঝিয়ে নেন। এইভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব সহজ ভাষায় লিখলেন। "শিক্ষা যারা আরম্ভ করছে গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশ্যক।" কবি 'বিজ্ঞানী মেজাজ' বলে একটা শব্দ ব্যবহার করতেন এবং দেশের মধ্যে বিজ্ঞানের চর্চা যাতে হয় তার জন্য বারবার বলেছেন।

শরীরের উপর জরা ও বার্ধক্য তাদের পায়ের কঠিন ছাপ ফেলে ফেলে চলছে—তবু বাইরের চাহিদাও আসে, এবং তিনি তা পূরণও করেন। পুরী, কালিমপং, মংপুতে গিয়ে বাস করলেন—আর মেদিনীপুর, সিউড়ী, বাঁকুড়া ঘুরে আসলেন নানা উৎসব অনুষ্ঠান করে।

মংপুতে ছিলেন বেশী দিন, অনেক কবিতা প্রবন্ধ এখানে লেখা। শেষ সফরে যান কালিম্পঙে (১৯৪০ সেপ্টেম্বর)। শরীর খুবই

খারাপ—ডাক্তারের নিষেধ না মেনে কালিম্পঙ গেলেন—সাতদিন যেতে না যেতেই অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় আনা হলো। 'রোগশয্যা'য় কাটলো, 'আরোগ্য' লাভ করলেন। কিন্তু আর ঘুরে ফিরে বেড়াবার শক্তি নেই।

এই অবস্থায় কবিতা, ছন্দ, প্রবন্ধ বলে যান—অন্যে লিখে নেয়। 'গল্পসল্প' বই ছেলেদের জন্য তাঁর শেষ রচনা—এর শেষ কবিতায় বলেন—

সাঙ্গ হয়ে এল পালা,
নাট্যশেষের দীপের মালা,
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,
রঙিন ছবির দৃশ্যরেখা,
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা,
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।
সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার
নেবে আসছে আঁধার যবনিকা,
খাতা হাতে—এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি,
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।
চোখের পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
কোনো মতেই চলবে না তো আর।
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে, কিংবা হোলো হার।

জীবনের শেষ সাতই পৌষ, এগারই মাঘ চলে গেল—বুঝতে পারছেন এ মর্ত্য জীবনে সেদিন আর না ফিরতে পারে।

শেষ নববর্ষের ভাষণ 'সভ্যতার সঙ্কট'। "আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ; কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।....মানুষের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

জীবনের শেষ ২৫ বৈশাখ এলো—

"আমার এ-জন্মদিন মাঝে আমি-হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতি রসে
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।...."

দেহের শান্তি নেই, আরাম নেই। শেষ পর্যন্ত আত্মীয় বন্ধুরা কবির দেহে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন—অবশ্য ডাক্তারের পরামর্শেই সব হচ্ছে।

শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় গেলেন (২৫ জুলাই ১৯৪১)—এই তাঁর শেষযাত্রা—এগারো বৎসর বয়সে পিতার সঙ্গে প্রথম বেড়াতে এসেছিলেন। তারপর চল্লিশ বৎসর বয়সে পিতার অনুমতি পেয়ে বিদ্যালয় সংস্থাপন করতেও এলেন। তারপর চল্লিশটি বৎসর এর কাজে কর্মে, সুখে দুঃখে, আনন্দ উৎসবে একাত্ম ছিলেন—আজ সেই সবই শেষবারের মতো ছাড়তে হলো।

কলকাতায় যাবার পাঁচদিন পরে অস্ত্রোপচার হলো—অস্ত্রাঘাতের পূর্বেই তাঁর শেষ কবিতায় বললেন—

তোমার সৃষ্টি পর রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে
হে ছলনাময়ী।

তারপর! তারপর ধীরে ধীরে রবি অস্তে নামলো। শ্রাবণের রাখি পূর্ণিমার অবসানে কবির মর্ত্যদেহ এই মৃত্তিকায় পড়ে থাকলো—কবির আত্মা বিশ্বাত্মায় বিলীন হয়েঁ গেল (১৯৪১, ৭ আগষ্ট—২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮)।